অধ্যায় ৩

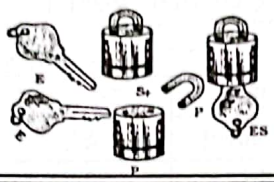

কোষ রসায়ন
Cell Chemistry

রাসায়নিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ জীবদেহ রাসায়নিক উপাদান দিয়ে গঠিত। জীব এসব উপাদান পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি ব্যবহার করে অথবা নানা উপায়ে সংশ্লেষণ, রূপান্তর ও পরিবর্তন করে। এ অধ্যায়ে কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ সম্বন্ধে ধারণা দেয়া হবে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- ☐ কার্বোহাইড্রেট
- ☐ প্রোটিন
- ☐ অ্যামিনো এসিড
- ☐ লিপিড
- ☐ স্টেরয়েড
- ☐ এনজাইম

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- ❖ জীবের রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে
- ❖ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস
- ❖ জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিডের ভূমিকা
- ❖ উৎসেচক বা এনজাইম-এর ক্রিয়ার প্রকৃতি
- ❖ এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস
- ❖ বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে উৎসেচকের ব্যবহার

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা
পাঠ ২	মনোস্যাকারাইড বা সরল শর্করা
পাঠ ৩	ডাইস্যাকারাইড
পাঠ ৪	পলিস্যাকারাইড
পাঠ ৫	প্রোটিন বা আমিষ
পাঠ ৬	লিপিড বা স্নেহ পদার্থ
পাঠ ৭	এনজাইম বা উৎসেচক
পাঠ ৮	এনজাইমের কর্মপদ্ধতি

জীবকোষের রাসায়নিক উপাদান (Chemical Components of Cells)

বিজ্ঞানের যে শাখায় কোষস্থ বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক উপাদানগুলোর বর্ণনা, পঠন-পাঠন ও গবেষণা করা হয় তাকে জৈবরসায়ন বা প্রাণরসায়ন (Biochemistry) বলা হয়।

জীবদেহ প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। রাসায়নিক উপাদানগুলো একত্রিত হয়ে **জটিল জৈব যৌগ** গঠন করে। জৈব যৌগগুলো বিভিন্নভাবে সমন্বিত হয়ে কোষীয় গঠন সৃষ্টি করে, যা জীবদেহের গঠন ও জৈবিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জীবকোষে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদানগুলোর মধ্যে যেগুলো কোষ নিজে তৈরি করতে পারে সেগুলোকে সাধারণভাবে **জৈবিক অণু** বা **জৈব অণু** (biomolecule) বলে।

১৭টি মৌল, যেমন– C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Na, Cl, Mn, B, S, Mo, Cu ও Zn মিলে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য জৈব উপাদান। জৈব অণুগুলোর মধ্যে কতকগুলো অতি সাধারণ ও ছোট, এদেরকে **মাইক্রোমলিকিউল** (micromolecules) বলে। অপরদিকে কিছু সংখ্যক অণু বৃহৎ আকৃতি ও জটিল গঠন বিশিষ্ট, এদেরকে বলা হয় **ম্যাক্রোমলিকিউল** (macromolecules)। এসব জৈব অণু সম্মিলিতভাবে জীবদেহ গঠন করে। জৈব অণুগুলো জীবের দৈহিক বৃদ্ধি, বিকাশ ও দেহ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন **বিপাক** (metabolism) প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

সকল জীব **বস্তু** (matter) দ্বারা গঠিত। বস্তু রাসায়নিক মৌল (element) দ্বারা গঠিত। যে বস্তুকে রাসায়নিকভাবে ভেঙ্গে আর কোনো সরল বস্তু পাওয়া যায় না তা হলো **রাসায়নিক মৌল** বা **element**।

জীবনে অত্যাবশ্যকীয় এলিমেন্ট (উপাদান) ৯২টি। ৯২টি এলিমেন্টের মধ্যে জীবের ৯৬% বস্তুই O_2, C, H_2 ও N_2 দিয়ে গঠিত। অন্যান্য এলিমেন্ট Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg অল্প পরিমাণে থাকে।

CamScanner

নিম্নোক্ত সারণি : ১ ও ২-এ কোষে বিদ্যমান উপাদানসমূহ দেখানো হলো।

সারণি–১ : কোষের রাসায়নিক গঠন উপাদান

উপাদান		শতকরা হার
অজৈব	পানি	৬০ – ৯০
	অন্যান্য	১ – ৫
জৈব	কার্বোহাইড্রেট	১ – ৫
	লিপিড	১ – ২
	প্রোটিন	৭ – ১০
	অন্যান্য জৈব পদার্থ	১ – ১.৫

সারণি– ২ : কোষের রাসায়নিক মৌলিক উপাদান

উপাদান	শতকরা হার	উপাদান	শতকরা হার
অক্সিজেন	৬২	পটাসিয়াম	০.১১
কার্বন	২০	সোডিয়াম	০.১০
নাইট্রোজেন	৩	ম্যাগনেসিয়াম	০.০৭
হাইড্রোজেন	১০	আয়োডিন	০.০১৩
ক্যালসিয়াম	২.৫	আয়রন	০.০১০
ফসফরাস	১.১৪	নগন্য (ট্রেস) উপাদান (কপার, সিলিকন ইত্যাদি)	০.৭৫৬
ক্লোরিন	০.১৬	মোট	১০০
সালফার	০.১৪		

এলিমেন্টের ক্ষুদ্রতম অংশ যা তার বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পারে তা হলো atom বা পরমাণু। বস্তু জগতের গঠন একক হলো এটম বা পরমাণু। এটমের কেন্দ্রস্থলে (নিউক্লিয়াসে) **প্রোটন** (+) এবং **নিউট্রন** (০) একসাথে থাকে। নিউক্লিয়াসের বাইরে নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট **ইলেক্ট্রন** থাকে। অধিকাংশ এটমে সমসংখ্যক **প্রোটন** (+) ও **ইলেকট্রন** (–) থাকে।

কম্পাউন্ড (Compound) বা যৌগ : দুই বা তার অধিক এলিমেন্ট সুনির্দিষ্ট অনুপাতে সংযুক্ত হয়ে একটি **কম্পাউন্ড** বা **যৌগ** গঠন করে, যেমন $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ অর্থাৎ H_2 এবং O_2 সুনির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত হয়ে পানি নামক যৌগ গঠন করেছে। একটি কম্পাউন্ডের এটমগুলো **রাসায়নিক বন্ডের** (chemical bond) মাধ্যমে একত্রে সংযুক্ত থাকে।

রাসায়নিক বন্ড (Chemical bond) : রাসায়নিক বন্ড সাধারণত তিন প্রকার; যথা Ionic (আয়োনিক), Covalent (কোভ্যালেন্ট) ও Hydrogen bond (হাইড্রোজেন বন্ড)।

আয়োনিক বন্ড (Ionic bond) : আয়োনিক বন্ড প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি এটমের মধ্যে। একটি এটম থেকে এক বা একাধিক ইলেক্ট্রন অন্য এটমে স্থানান্তর হয়। প্রথম এটম ইলেক্ট্রন হারিয়ে পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট হয় এবং অপরটি ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট হয়। এটমের চার্জ বিশিষ্ট (+ অথবা –) অবস্থাকে **আয়ন** (ion) বলে। পজিটিভ (+) এবং নেগেটিভ (–) চার্জ বিশিষ্ট আয়ন প্রবলভাবে পরস্পরকে আকর্ষণ করে যার ফলে **আয়নিক বন্ড** তৈরি হয়।

কোভ্যালেন্ট বন্ড (Covalent bond) : দুটি এটমের মধ্যে ইলেকট্রন শেয়ার বা ভাগাভাগি হলে **কোভ্যালেন্ট বন্ড** সৃষ্টি হয়। দুটি এটমের মধ্যে ইলেক্ট্রন সমানভাবে ভাগাভাগি হলে যে বন্ড তৈরি হয় তা হলো Nonpolar covalent বন্ড। ইলেকট্রন দুটি এটমের মধ্যে অসমভাবে ভাগাভাগি হলে যে বন্ড তৈরি হয় তা হলো Polar covalent বন্ড।

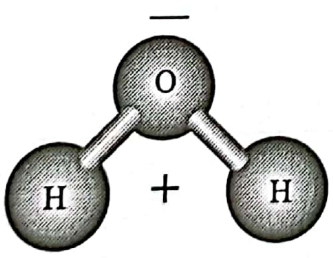

H_2O : একটি পোলার অণু

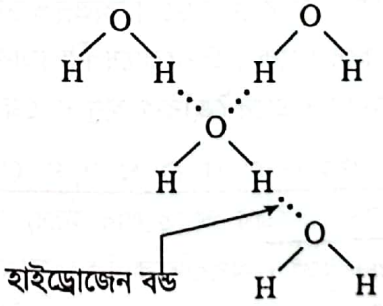

পানির অণুতে হাইড্রোজেন বন্ড

চিত্র : ৩.১ : পোলার অণু ও হাইড্রোজেন বন্ড

হাইড্রোজেন বন্ড (Hydrogen bond) : এক অণুর আংশিক পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট হাইড্রোজেন পরমাণু (atom) এবং অপর অণুর (molecule) আংশিক নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণজনিত শক্তির (attraction force) কারণে যে বন্ড তৈরি হয় তা হলো **হাইড্রোজেন বন্ড**।

পেপটাইড বন্ড (Peptide bond) : দুটি অ্যামিনো এসিডের মধ্যকার সৃষ্ট বন্ড। এটি **কোভ্যালেন্ট বন্ড**।

গ্লাইকোসাইডিক বন্ড (Glycosidic bond) : মনোস্যাকারাইডসমূহের মধ্যকার বন্ড হলো গ্লাইকোসাইডিক বন্ড।

CamScanner

ক. অজৈব (inorganic) বস্তু : যেসব রাসায়নিক বস্তুতে কার্বন (C) ও হাইড্রোজেন (H) পরমাণু থাকে না, তাদের অজৈব বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়। অজৈব বস্তুর মধ্যে পানি, খনিজ লবণ, বহু প্রকার আয়ন ও পানিতে দ্রবীভূত গ্যাস উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে পানির পরিমাণই বেশি। জীবদেহের ৭০-৮০% পানি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। জীবকোষে **মুখ্য খনিজ** (major mineral), যেমন–Ca, P, Na, Cl, O, Mg, S, K ও N এবং **গৌণ খনিজ** (minor mineral), যেমন–Fe, Cu, CO, Mn, Mo, Zn, F, I, Cr ও Se নামক বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কোষের জন্য বেশি পরিমাণে প্রয়োজন এমন মৌলগুলোকে (যেমন– N, P, K, Mg, S, Ca ও Fe) **ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট** (macronutrient) এবং অল্প পরিমাণে প্রয়োজন এমন মৌলগুলোকে (যেমন–Mn, Zn, B, Cu, Co, Mo, Cl ও Ni) **মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট** (micronutrient) বলা হয়।

খ. জৈব (organic) দ্রব্য : যেসব কোষীয় বস্তুর রাসায়নিক গঠনে কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে, তাদের জৈব দ্রব্য হিসেবে গণ্য করা হয়। উল্লেখযোগ্য জৈব দ্রব্য কার্বোহাইড্রেট, অ্যামিনো এসিড, প্রোটিন, লিপিড, এনজাইম, নিউক্লিক এসিড, হরমোন, ভিটামিন ইত্যাদি। জীবদেহে যত রকমের জৈব দ্রব্য বা জৈব যৌগ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিড-এর পরিমাণই সর্বাধিক। এই তিন উপাদানের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট ও লিপিড প্রধানত শক্তি উৎপাদক পদার্থ হিসেবে এবং প্রোটিন মূলত দেহ গঠনকারী পদার্থ হিসেবে অবস্থান করে।

Different Functional Groups

Name (নাম)	Structure (গঠন)	Molecule (অণু শ্রেণি)	Example (উদাহরণ)
Hydroxyl	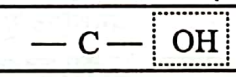	Alcohol	Ethyl Alcohol
Carbonyl	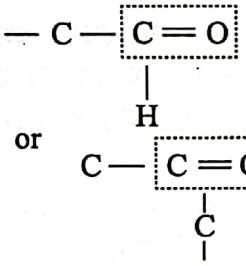	Aldehyde	Acetaldehyde
	or	Ketone	Acetone
Carboxyl	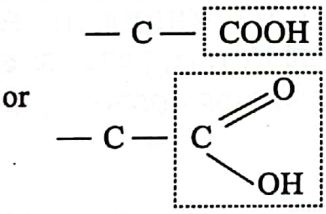	Oranic acid	Acetic acid
Amino	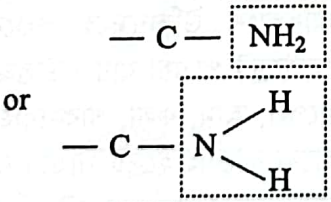	Amino acid	Alanine
Phosphate	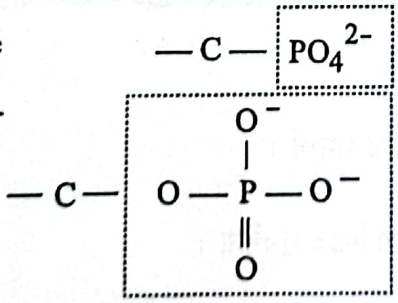	Nucleotide Nucleic acid	Glyceraldehyde-3-Phosphate
Sulfhydril	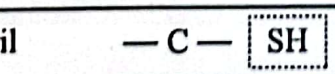	many cellular molecules	Mercatoethanol

অর্গানিক মলিকিউল বা জৈব অণু (Organic molecule) : জীবসমূহে বিদ্যমান অধিকাংশ যৌগ কার্বন পরমাণুর একটি কাঠামো নিয়ে গঠিত যার চারপাশে হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে; কখনও কখনও কিছু অন্য মৌলও থাকতে পারে। এ ধরনের অণুকে **জৈব অণু** বলা হয়। যে অণুতে কোনো কার্বন-হাইড্রোজেন পরমাণু নেই তা হলো **অজৈব যৌগ** (inorganic compound)।

কোনো জৈব অণুর ক্রিয়াশীল (reactive) গ্রুপকে বলা হয় Functional group। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় কয়েকটি Functional group -এর উদাহরণ দেয়া হলো। Functional group সাধারণত আয়নিক বা পোলার হয়।

কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates) বা শর্করা

কার্বন+হাইড্রেট থেকে **কার্বোহাইড্রেট** কথাটি এসেছে। অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট হলো পানি সমন্বিত কার্বন যৌগ। বাংলায় এর প্রতিশব্দ **'শর্করা'**। কার্বোহাইড্রেটকে **কার্বস** (carbs), Staff of Life বা **স্যাকারাইডসও** বলা হয়। জীবদেহে প্রধানত শক্তি উৎপাদন করে। কার্বোহাইড্রেট হলো কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) ও অক্সিজেন (O) দ্বারা গঠিত এক প্রকারের জৈব যৌগ।

যে সকল অ্যালডিহাইড বা কিটোন জাতীয় যৌগে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে অথবা যারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে কতগুলো হাইড্রোক্সিল গ্রুপযুক্ত অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন করে সেসব যৌগকে কার্বোহাইড্রেট বলে। কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা পলিহাইড্রক্সি কিটোন অথবা এদের derivatives (উদ্ভূত যৌগসমূহ)।

কার্বোহাইড্রেটে সাধারণ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু 1 : 2 : 1 অনুপাতে যুক্ত থাকে। এদের সাধারণ আণবিক সংকেত হচ্ছে $(CH_2O)_n$। এখানে n হলো 3 বা তদূর্ধ্ব সংখ্যা। যেমন– গ্লুকোজের সংকেত $C_6H_{12}O_6$।

একাধিক মনোস্যাকারাইড সহযোগে যেসব কার্বোহাইড্রেট গঠিত হয় সেসব ক্ষেত্রে এই সাধারণ ফরমুলা প্রযোজ্য নয়। যখন এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনীর মাধ্যমে একত্রিত হয়ে এক অণু সুক্রোজ গঠন করে তখন এই সাধারণ ফর্মুলা কার্যকরী হয় না, কারণ বন্ধনী সৃষ্টিকালে এক অণু পানি (H_2O) বের হয়ে যায়, তাই সুক্রোজ এর ফর্মুলা দাঁড়ায় $C_{12}H_{22}O_{11}$।

কয়েকটি কার্বোহাইড্রেটে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন 2 : 1 অনুপাতে থাকে না, ভিন্ন অনুপাতে থাকে। যেমন– ডিঅক্সিরাইবোজ ($C_5H_{10}O_4$), র‍্যামনোজ ($C_6H_{12}O_5$), সরবিটল ($C_6H_{14}O_6$) ইত্যাদি।

আবার অ্যাসিটিক এসিড (CH_3COOH), ল্যাকটিক এসিড ($CH_3CHOHCOOH$), ফরম্যালডিহাইড (HCHO) ইত্যাদির হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত উপরোক্ত সংকেতের $[(CH_2O)_n]$ আওতায় হলেও এরা কার্বোহাইড্রেট নয়। এছাড়াও কিছু কার্বোহাইড্রেটে নাইট্রোজেন ও সালফার ইত্যাদি থাকে। যেমন– গ্লুকোস্যামাইন ($C_5H_{11}O_5NH_2$) এখানে অতিরিক্তভাবে নাইট্রোজেন থাকে।

কার্বোহাইড্রেটের উৎস

কার্বোহাইড্রেটের প্রধান উৎস হলো **উদ্ভিজ্জ খাদ্য**। অধিকাংশ উদ্ভিদদেহে শুকনো ওজনের ৫০-৮০% কার্বোহাইড্রেট থাকে। তবে প্রাণিদেহেও সামান্য পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে রয়েছে– চাল, গম, ভুট্টা, ডাল, আলু, বিট, গাজর, কচু, খেজুর, আঙুর, আপেল, আম, কলা, শাকসবজি ইত্যাদি। এছাড়া ভাত, মুড়ি, চিড়া, আটা, ময়দা, গুড়, চিনি, মিছরি, বার্লি, সাগু প্রভৃতি খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়। প্রাণিদেহের যকৃতে, পেশি ও দুধে যথাক্রমে গ্লাইকোজেন, ল্যাকটিক এসিড ও ল্যাকটোজেনরূপে কার্বোহাইড্রেট সঞ্চিত থাকে। ছত্রাকে সঞ্চিত খাদ্যরূপে গ্লাইকোজেন থাকে।

কার্বোহাইড্রেটের (শর্করার) বৈশিষ্ট্য

১. এটি দানাদার (চিনি), তন্তুময় (সেলুলোজ) বা পাউডার জাতীয় পদার্থ।
২. এরা স্বাদে মিষ্টি (সুক্রোজ) বা স্বাদহীন (সেলুলোজ)।
৩. এদের অধিকাংশই পানিতে অদ্রবণীয় তবে মনোস্যাকারাইড পানিতে দ্রবণীয়।
৪. এসিডের সাথে মিশে এস্টার গঠন করে।
৫. এরা আলোক সক্রিয় ও আলোক সমাণুতা প্রদর্শন করে।
৬. অধিক তাপে অঙ্গারে পরিণত হয়।

CamScanner

জীবদেহে কার্বোহাইড্রেটের গুরুত্ব

১. জীবদেহের শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে এবং জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।
২. উদ্ভিদের সাপোর্টিং টিস্যুর গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
৩. উদ্ভিদদেহ গঠনকারী পদার্থগুলোর **কার্বন কাঠামো** (carbon skeleton) প্রদান করে।
৪. প্রাণিদেহে হাড়ের সন্ধিস্থলে **লুব্রিকেন্ট** হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৫. উদ্ভিদদেহে **সঞ্চয়ী পদার্থ** হিসেবে বিরাজ করে।
৬. ক্যালভিন চক্র, ক্রেবস্ চক্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ চক্রে কার্বোহাইড্রেট সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
৭. বিভিন্ন উদ্ভিদদেহে ও শৈবালে স্টার্চ, ইনুলিন ইত্যাদি হিসেবে কার্বোহাইড্রেট সঞ্চিত থাকে।
৮. এরা প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ, নিষেক, রক্তজমাট বাঁধা ও পরিস্ফুটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
৯. বিভিন্ন প্রকার কো-এনজাইমের গাঠনিক অংশ হিসেবে থাকে। যেমন–ATP, NADP, FAD ইত্যাদি।
১০. ফ্যাটি এসিড ও অ্যামিনো এসিড বিপাকে সাহায্য করে।
১১. সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, কাইটিন, পেকটিন ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট কোষপ্রাচীরের প্রধান উপাদান।
১২. নিউক্লিক এসিডের অন্যতম উপাদান রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ হলো পেন্টোজ জাতীয় শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)।
১৩. **হেপারিন** নামক পলিস্যাকারাইড রক্তে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর হিসেবে থেকে রক্তনালিকায় রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করে, এজন্য রক্ত চলমান থাকে।
১৪. প্রাণী, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া **গ্লাইকোজেন** নামক কার্বোহাইড্রেট সঞ্চয় করে।
১৫. আমাদের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় এর অনেক উপাদান কার্বোহাইড্রেট থেকে আসে।
১৬. **সেলুলোজ** জাতীয় কার্বোহাইড্রেট উদ্ভিদকে দৃঢ়তা ও সুরক্ষা প্রদান করে।
১৭. কোষীয় গঠনে গ্লাইকোক্যালিক্স কার্বোহাইড্রেট দিয়ে তৈরী হয়।
১৮. অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের (যেমন–Insect ও Crustacea প্রাণী) বহিঃকঙ্কাল গঠনে কাইটিন জাতীয় কার্বোহাইড্রেট ভূমিকা রাখে।

কার্বোহাইড্রেট-এর শ্রেণিবিভাগ (Classification of carbohydrates)

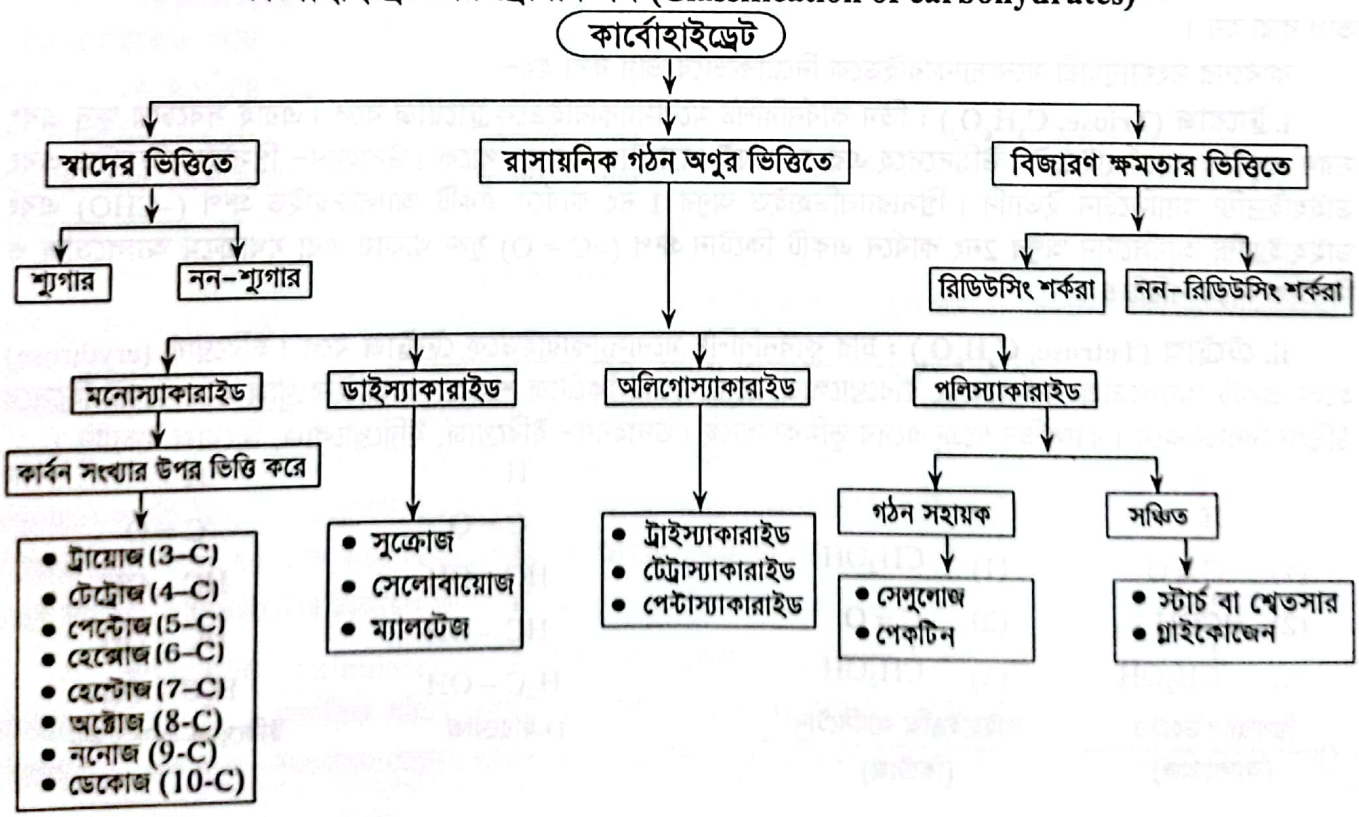

● **স্বাদের বা ভৌত ধর্মের ওপর ভিত্তি করে** কার্বোহাইড্রেট দুই প্রকার, যথা–

১. **শুগার (Sugar) :** এরা স্বাদে মিষ্টি, দানাদার এবং পানিতে দ্রবণীয়। উদাহরণ–গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ ইত্যাদি।

২. **নন-শুগার (Non-sugar) :** এরা স্বাদে মিষ্টি নয় অর্থাৎ স্বাদহীন, অদানাদার এবং সাধারণত পানিতে অদ্রবণীয়। উদাহরণ– স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি।

● **রাসায়নিক গঠন অণুর ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।** এগুলো হলো– ১. মনোস্যাকারাইড (Monosaccharides); ২. ডাইস্যাকারাইড (Disaccharides); ৩. অলিগোস্যাকারাইড (Oligosaccharides) এবং ৪. পলিস্যাকারাইড (Polysaccharides)। নিম্নে রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করা হলো।

১. মনোস্যাকারাইড (Monosaccharides; গ্রিক. *mono* = এক, *saccharin* = চিনি)

যেসব কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস বা আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে আর কোনো সরল কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না, তাদের **মনোস্যাকারাইড** বলে। এরা জীবদেহে এককভাবে অথবা অন্যান্য সকল জটিল কার্বোহাইড্রেট তৈরির গাঠনিক একক (building unit) হিসেবে কাজ করে। এদের রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে $C_nH_{2n}O_n$।

এরা স্বাদে মিষ্টি, দানাদার, পানিতে দ্রবণীয়, আলোক সক্রিয় এবং কেলাস গঠন করে। মনোস্যাকারাইডগুলোতে একটি অ্যালডিহাইড (–CHO) বা কিটোন গ্রুপ (>C = O) মুক্তভাবে এবং একাধিক হাইড্রোক্সিল গ্রুপ (–OH) থাকে। তাই অ্যালডিহাইড ও কিটোনযুক্ত সকল মনোস্যাকারাইডকে **বিজারক চিনি** বা **রিডিউসিং শুগার** (reducing sugar) বা **বিজারক শর্করা** বলে। এরা পানিতে অধিক দ্রাব্য, অ্যালকোহলে সামান্য পরিমাণে দ্রাব্য ও ইথারে অদ্রাব্য।

মনোস্যাকারাইডের –CHO বা >C = O গ্রুপ বেনেডিক্ট দ্রবণ $Cu(OH)_2$ (কিউপ্রাস হাইড্রোঅক্সাইড)-এর সাথে বিক্রিয়া করে Cu_2O (কিউপ্রাস অক্সাইড)-এ পরিণত হয়, যা লাল বর্ণের অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে। অ্যালডিহাইড গ্রুপযুক্ত (–CHO) মনোস্যাকারাইডকে অ্যালডোজ বা অ্যালডোজ সুগার (aldose sugar) এবং কিটোন গ্রুপযুক্ত (>C = O) মনোস্যাকারাইডকে **কিটোজ** বা **কিটোজ শুগার** (ketose sugar) নামে অভিহিত করা হয়। মনোস্যাকারাইডে কার্বনের সংখ্যা 3-10। অধিকাংশ মনোস্যাকারাইড অপ্টিক্যাল আইসোমারের D সিরিজভুক্ত। কার্বনের সংখ্যা অনুযায়ী মনোস্যাকারাইডকে তিন কার্বনবিশিষ্ট **ট্রায়োজ** (triose), চার কার্বন বিশিষ্ট **টেট্রোজ** (tetrose), পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট **পেন্টোজ** (pentose), ছয় কার্বনবিশিষ্ট **হেক্সোজ** (hexose), সাত কার্বনবিশিষ্ট **হেপ্টোজ** (heptose), আট কার্বন বিশিষ্ট **অক্টোজ** (octose), নয় কার্বন বিশিষ্ট হলে **ননোজ** (nonose), দশ কার্বনবিশিষ্ট হলে **ডেকোজ** (decose), ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়।

কার্বনের সংখ্যানুযায়ী মনোস্যাকারাইডকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়–

i. ট্রায়োজ (Triose, $C_3H_6O_3$) : তিন কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে **ট্রায়োজ** বলে। এরাই সবচেয়ে ক্ষুদ্র এবং সরল প্রকৃতির কার্বোহাইড্রেট। উদ্ভিদদেহে এরা **ফসফেট অ্যাস্টার** হিসেবে থাকে। উদাহরণ– গ্লিসার‍্যালডিহাইড এবং ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ইত্যাদি। গ্লিসার‍্যালডিহাইড অণুর **1 নং** কার্বনে একটি অ্যালডিহাইড গ্রুপ (–CHO) এবং ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন অণুর 2নং কার্বনে একটি কিটোন গ্রুপ (>C = O) যুক্ত থাকায় এরা যথাক্রমে অ্যালডোজ ও কিটোজ নামে পরিচিত।

ii. টেট্রোজ (Tetrose, $C_4H_8O_4$) : চার কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে **টেট্রোজ** বলে। ইরিথ্রোজ (erythrose) হলো একটি অ্যালডোজ শর্করা এবং ইরিথ্রোলোজ হলো একটি কিটোজ শর্করা। এরা ইরিথ্রোজ-4 ফসফেট হিসেবে উদ্ভিদে বিরাজ করে। ক্যালভিন চক্রে এদের ভূমিকা আছে। উদাহরণ– ইরিথ্রোজ, ইরিথ্রোলোজ, থ্রিয়োজ ইত্যাদি।

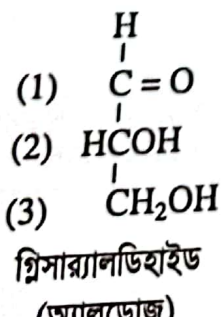

গ্লিসার‍্যালডিহাইড
(অ্যালডোজ)

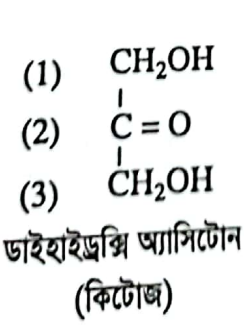

ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন
(কিটোজ)

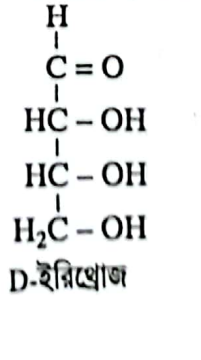

D-ইরিথ্রোজ

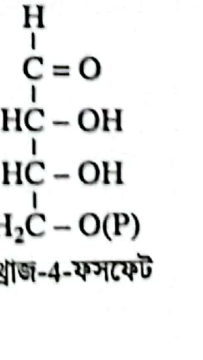

ইরিথ্রোজ-4-ফসফেট

CamScanner

iii. পেন্টোজ (Pentose, $C_5H_{10}O_5$) : পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে বলা হয় পেন্টোজ। জাইলোজ, রাইবোজ, ডিঅক্সিরাইবোজ ও অ্যারাবিনোজ হলো অ্যালডোজ শর্করা এবং রাইবুলোজ ও জাইলুলোজ হলো কিটোজ শর্করা।

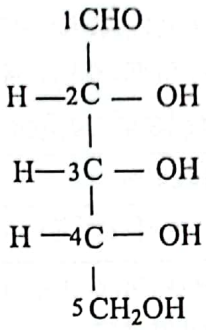

রাইবোজ (অ্যালডোজ)

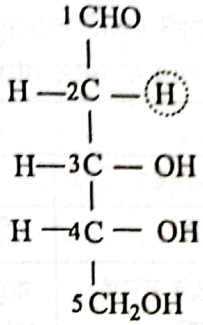

ডিঅক্সিরাইবোজ [ডিঅক্সিরাইবোজের ক্ষেত্রে ২নং কার্বনের OH এর পরিবর্তে H থাকে।]

□ **রাইবোজ (Ribose) :** এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট পেন্টোজ শ্যুগার। ১৮৯১ সালে **Emil Fisher** এটি আবিষ্কার করেন। এটি রাইবোনিউক্লিক এসিডের (RNA) একটি গঠন একক। এর আণবিক সংকেত $C_5H_{10}O_5$। এতে একটি (–CHO) গ্রুপ থাকায় এদের অ্যালডোপেন্টোজ বলা হয়। রাইবোজ শর্করার গলনাঙ্ক ৯৫° সে.। এটি গাঢ় HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল এসিড উৎপন্ন করে। RNA-তে কেবলমাত্র রাইবোজ শ্যুগারই নিউক্লিওটাইড বা নিউক্লিওসাইড তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। এটি নির্দিষ্ট পিউরিন বা পাইরিমিডিন বেস এর সাথে যুক্ত হয়ে একটি **নিউক্লিওসাইড** উৎপন্ন করে। নিউক্লিওসাইডের সাথে একটি অজৈব ফসফেট যুক্ত হয়ে **নিউক্লিওটাইড**-এ পরিণত হয়। কার্বন বিজারণের মাধ্যমে শর্করা তৈরি প্রক্রিয়াতেও রাইবোজ ভূমিকা পালন করে। ATP, NAD^+, $NADP^+$, FAD, CO-A ইত্যাদি জৈব অণুর সাথেও রাইবোজ যুক্ত থাকে। রাইবোজ বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন।

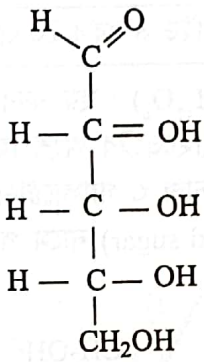

D-রাইবোজ (চেইন স্ট্রাকচার)

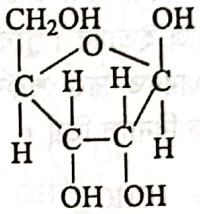

D-রাইবোজ (রিং স্ট্রাকচার)

□ **ডিঅক্সিরাইবোজ (Deoxyribose) :** ডিঅক্সিরাইবোজ আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পেন্টোজ শ্যুগার। এর আণবিক সংকেত $C_5H_{10}O_4$। এতে একটি অ্যালডিহাইড (–CHO) গ্রুপ (বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) থাকায় একে **ডিঅক্সিঅ্যালডোপেন্টোজও** বলে। এটি রাইবোজ শ্যুগার-এর মতোই, পার্থক্য শুধু এই যে, এর ২নং কার্বনে –OH গ্রুপের পরিবর্তে কেবল একটি হাইড্রোজেন (H) পরমাণু আছে। ডিঅক্সি অর্থ হলো অক্সিজেন ছাড়া (without oxygen) অর্থাৎ ২নং কার্বনে কোনো অক্সিজেন নেই। এর ১নং কার্বন অবস্থানে যে কোনো একটি পিউরিন বা পাইরিমিডিন বেস (A, T, G, C) যুক্ত হলে একটি **ডিঅক্সিনিউক্লিওসাইড** সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় ৫নং কার্বন অবস্থানে অজৈব ফসফেট যুক্ত হলে একটি **ডিঅক্সিনিউক্লিওটাইড** সৃষ্টি হয়। DNA- নিউক্লিক এসিডের নিউক্লিওটাইড গঠনের অংশ হিসেবে বিরাজ করে ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার। এই শ্যুগার ছাড়া DNA গঠন সম্ভব নয়। ডিঅক্সিরাইবোজ বিজারণ ক্ষমতাসম্পন্ন।

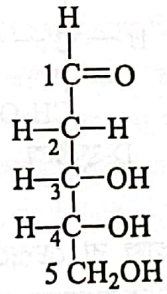

D - 2, ডিঅক্সিরাইবোজ (চেইন স্ট্রাকচার)

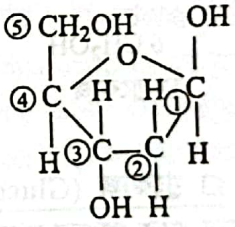

β - D - 2, ডিঅক্সিরাইবোজ (রিং স্ট্রাকচার)

□ **রাইবুলোজ (Ribulose) :** রাইবুলোজ হলো একধরনের পেন্টোজ মনোস্যাকারাইড। এর আণবিক গঠনে একটি কিটোগ্রুপ (>C = O) রয়েছে। তাই একে কিটোপেন্টোজও বলে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় রাইবুলোজ হতে তৈরি হয় রাইবুলোজ ১,

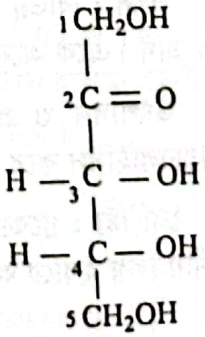

D-রাইবুলোজ (কিটোজ)

৫-ডাইফসফেট। এটি সালোকসংশ্লেষণে CO_2 গ্রাহক হিসেবে কাজ করে। এটি পরে বিজারিত হয়ে একটি কার্বোক্সিল যৌগ গঠন করে যা সাথে সাথে ফসফোগ্লিসারিক এসিডের দুটি অণু প্রদান করে।

রাইবোজ এবং ডিঅক্সিরাইবোজের মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	রাইবোজ	ডিঅক্সিরাইবোজ
১. উপাদান	এটি হলো RNA এর অপরিহার্য উপাদান।	এটি হলো DNA এর অপরিহার্য উপাদান।
২. HCl-এর সাথে বিক্রিয়া	গাঢ় HCl এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল এসিড তৈরি করে।	গাঢ় HCl এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লেভ্যুলিনিক এসিড তৈরি করে।
৩. অক্সিজেন পরমাণু	আণবিক গঠনে ৫টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।	আণবিক গঠনে ৪টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।
৪. –OH গ্রুপ	২ নং কার্বন পরমাণুর সাথে –OH গ্রুপ থাকে।	২ নং কার্বন পরমাণুর সাথে –OH গ্রুপ থাকে না।
৫. অংশগ্রহণ	নিউক্লিওটাইড ও শর্করা তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।	ডিঅক্সিনিউক্লিওটাইড গঠনে অংশগ্রহণ করে।

iv. হেক্সোজ (Hexose, $C_6H_{12}O_6$) : ছয় কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে হেক্সোজ বলে। এরা কোষে মুক্ত অবস্থায় অথবা অন্য জটিল কার্বোহাইড্রেটের অংশ হিসেবে বিদ্যমান থাকে। উদাহরণ– গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, গ্যালাক্টোজ ইত্যাদি। গ্লুকোজ, ম্যানোজ ও গ্যালাক্টোজ হচ্ছে অ্যালডোজ শুগার, কিন্তু ফ্রুক্টোজ হচ্ছে কিটোজ শুগার। এরা সাধারণত **'রক্ত শর্করা'** (blood sugar) নামে পরিচিত। এদের সবগুলো গাঠনিক ফর্মুলা $C_6H_{12}O_6$ কিন্তু এদের অ্যাটমিক বিন্যাস ভিন্ন।

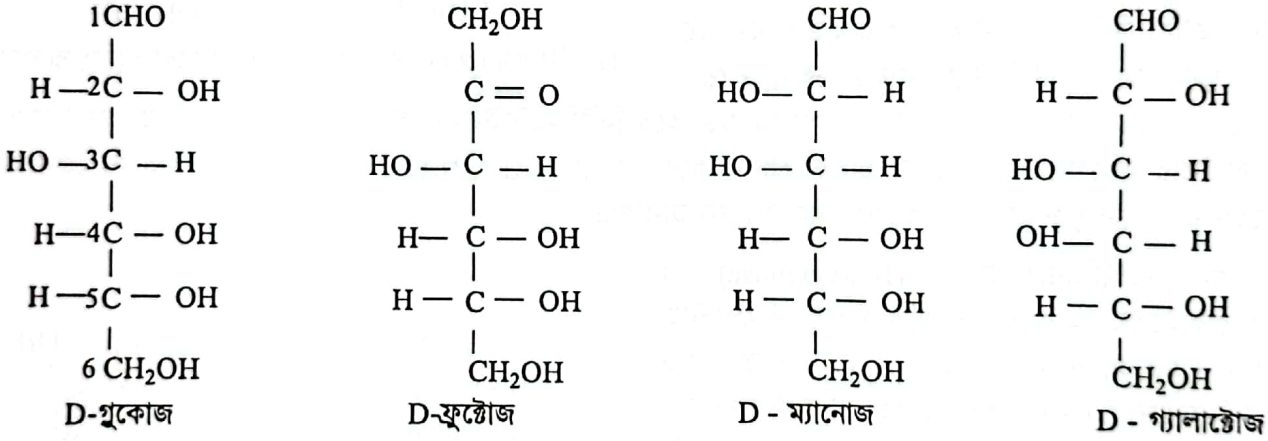

□ **গ্লুকোজ (Glucose) :** গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ একটি উল্লেখযোগ্য মনোস্যাকারাইড। উদ্ভিদকোষে দ্রবণীয় অবস্থায় একে পাওয়া যায়। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটি একটি অ্যালডোহেক্সোজ কারণ এতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (–CHO) আছে। এটি একটি রিডিউসিং শুগার বা বিজারণক্ষম শর্করা।

উৎস : বিভিন্ন প্রকার পাকা ফল ও মধুতে প্রচুর গ্লুকোজ থাকে। পাকা আঙ্গুরে গ্লুকোজের পরিমাণ শতকরা ১২–৩০ ভাগ। একে অনেক সময় **গ্রেইপ শুগার** (grape sugar) বা আঙ্গুরের শর্করা বলা হয়।

উৎপাদন ও প্রস্তুত প্রণালি : প্রকৃতিতে সবুজ উদ্ভিদ থেকে গ্লুকোজ উৎপাদিত হয়। আবার গবেষণাগারে হাইড্রোলাইসিস করে সুক্রোজ ও স্টার্চ থেকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ প্রস্তুত করা যায়।

বৈশিষ্ট্য : গ্লুকোজ সাদা দানাদার পদার্থ। স্বাদে মিষ্টি এবং পানিতে সহজেই দ্রবণীয়। এটি অ্যালকোহলে সামান্য দ্রবণীয় কিন্তু ইথারে অদ্রবণীয়। উদ্ভিদে গ্লুকোজ কখনো সঞ্চিত পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে না।

CamScanner

গ্লুকোজের ব্যবহার : (i) রোগীর পথ্য হিসেবে গ্লুকোজ-এর বহুল ব্যবহার প্রচলিত। (ii) এটি রোগীকে দ্রুত শক্তি যোগায়। (iii) বিভিন্ন ফল সংরক্ষণে গ্লুকোজ ব্যবহার করা হয়। (iv) ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ওষুধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। (v) ভিটামিন 'সি' তৈরি করার জন্য গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়। (vi) গ্লুকোজ সরবিটল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। (vii) গ্লুকোজ কার্বোহাইড্রেট বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (viii) শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ হিসেবে গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়।

গ্লুকোজের রিং স্ট্রাক্চার এবং α/β-D গ্লুকোজ : গ্লুকোজের ১নং কার্বন এবং ৫নং কার্বন কাছাকাছি এলে (দ্রবণে সাধারণত কাছাকাছি আসে) এদের মধ্যে একটি অক্সিজেন সেতু তৈরি হয়। এর ফলে ১নং কার্বনে একটি –OH গ্রুপ সৃষ্টি হয়। নতুন সৃষ্ট এই –OH গ্রুপ ১নং কার্বনের α (আলফা) অথবা β (বিটা) অবস্থানে থাকতে পারে। –OH গ্রুপের এই α এবং β অবস্থানের কারণে গ্লুকোজের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে; যেমন– β- গ্লুকোজ গঠন করে **সেলুলোজ**, কিন্তু α- গ্লুকোজ গঠন করে **স্টার্চ**। সেলুলোজ কোষের গাঠনিক বস্তু এবং স্টার্চ কোষের সঞ্চয়ী খাদ্য বস্তু।

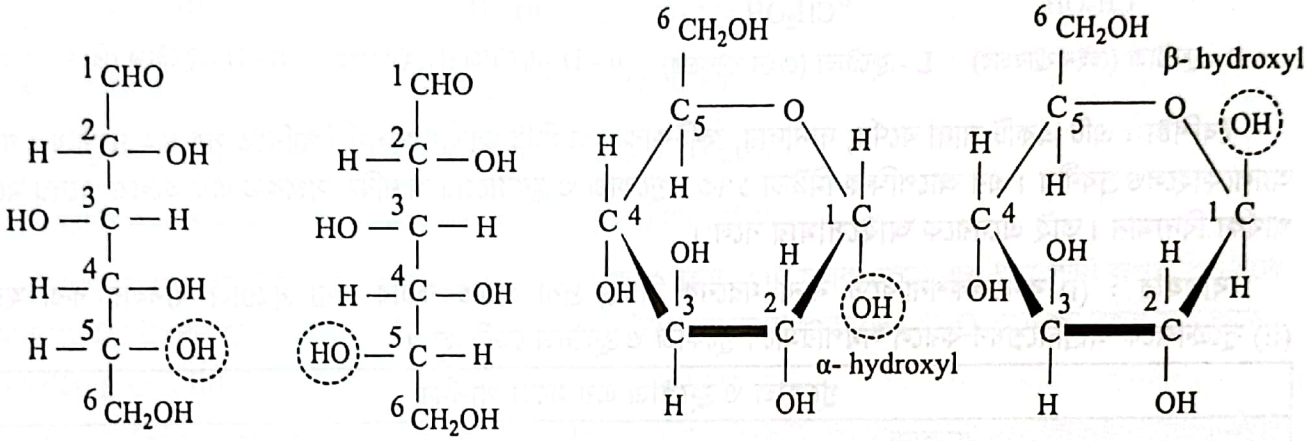

D - গ্লুকোজ (চেইন স্ট্রাকচার) L - গ্লুকোজ (চেইন স্ট্রাকচার) α- D- গ্লুকোজ (রিং স্ট্রাকচার) β - D- গ্লুকোজ (রিং স্ট্রাকচার)

D এবং L গ্লুকোজ : গ্লুকোজের ৫নং কার্বনে সংযুক্ত (–OH) মূলক ডান দিকে থাকলে তাকে বলা হয় D– গ্লুকোজ। ৫নং কার্বনে সংযুক্ত (–OH) মূলক বাম দিকে থাকলে তাকে বলা হয় L-গ্লুকোজ। D-গ্লুকোজ দক্ষিণাবর্ত (dextrorotatory) হয় যাকে d বা '+' চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। L-গ্লুকোজ বামাবর্ত (laevorotatory) হয় যাকে *l* বা '–' চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। দক্ষিণাবর্ত অর্থ হলো যৌগটি আলোক সক্রিয় এবং ঘূর্ণনের দিক 'ডান'; বামাবর্ত অর্থ হলো যৌগটি আলোকে সক্রিয় এবং ঘূর্ণনের দিক 'বাম'। গ্লুকোজের d বা *l* ফরম optical rotation ছাড়া অন্যান্য সকল ভৌত বৈশিষ্ট্য একই প্রকার। **উদ্ভিদে সব সময়ই D-গ্লুকোজ থাকে।**

প্রাকৃতিক সকল গ্লুকোজই D গ্লুকোজ প্রকৃতির। ডায়াবেটিস-এর ওষুধ এবং এন্ডোস্কোপির কাজে ব্যবহারের জন্য L গ্লুকোজ কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয়।

□ **ফ্রুক্টোজ (Fructose) :** গ্লুকোজের মতো ফ্রুক্টোজও ৬ কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইড। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$ (গ্লুকোজের মতোই)। এটিও একটি রিডিউসিং শ্যুগার বা বিজারণক্ষম শর্করা। এর গঠনে রয়েছে একটি কিটো গ্রুপ (>C = O)। একে কিটোহেক্সোজও বলা হয়। গ্লুকোজের মতো ফ্রুক্টোজও D এবং L দু'প্রকার।

নামকরণ : প্রথমে ফ্রুট বা ফল থেকে শনাক্ত হওয়ার কারণে এর নাম ফ্রুক্টোজ।

উৎস : পাকা মিষ্টি ফল ও ফুলের মধু।

ফ্রুক্টোজ ফল ও মধুতে পাওয়া যায়, তাই এর আরেক নাম **ফলের চিনি বা ফ্রুট শ্যুগার** (fruit sugar)।

CamScanner

উৎপাদন : গ্লুকোজ থেকে ফ্রুক্টোজ তৈরী করা যায়। আবার সুক্রোজকে হাইড্রোলাইসিস করেও ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়। ফ্রুক্টোজ ও সমপরিমাণ গ্লুকোজ একত্রে যুক্ত করলে চিনি তৈরী হয়। বীট ও আখের কান্ড রসে প্রচুর পরিমাণ চিনি থাকে।

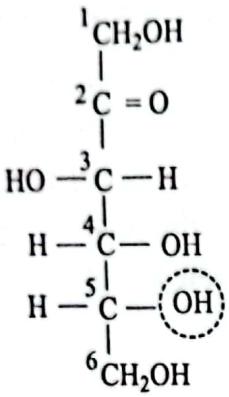
D - ফ্রুক্টোজ (চেইন স্ট্রাকচার)

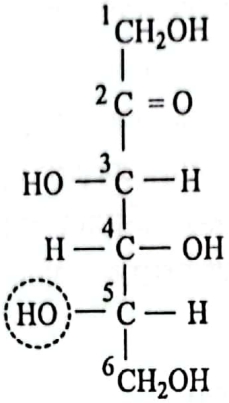
L - ফ্রুক্টোজ (চেইন স্ট্রাকচার)

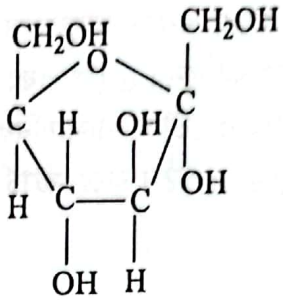
α - D - ফ্রুক্টোজ (রিং স্ট্রাকচার)

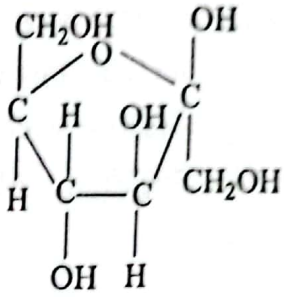
β - D - ফ্রুক্টোজ (রিং স্ট্রাকচার)

বৈশিষ্ট্য : এটি একটি সাদা বর্ণের, দানাদার, স্ফটিকাকার ও মিষ্টি জাতীয় পদার্থ। পানিতে সহজেই দ্রবণীয়। গরম অ্যালকোহলেও দ্রবণীয়। এর আপেক্ষিক মিষ্টতা ১৭৩। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের আণবিক সংকেত এক হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। তাই এদেরকে **আইসোমার** বলে।

ব্যবহার : (i) কনফেকশনারিতে নানা ধরনের মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য ফ্রুক্টোজ ব্যবহার করা হয়। (ii) সুক্রোজকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে সমপরিমাণে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ তৈরি হয়।

গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ এর মধ্যে পার্থক্য

গ্লুকোজ	ফ্রুক্টোজ
১. এটি একটি অ্যালডোহেক্সোজ কারণ এতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ (–CHO) আছে।	১. এটি একটি কিটোহেক্সোজ কারণ এতে কিটো গ্রুপ (<C = O) আছে।
২. একে গ্রেইপ শুগার বা আঙুরের শর্করা বলা হয়।	২. একে ফ্রুট শুগার বলা হয়।
৩. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।	৩. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয় না।
৪. শ্বসনের প্রাথমিক পদার্থ হলো গ্লুকোজ।	৪. শ্বসনে গ্লুকোজ হতে ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন হয়।
৫. এদের রিং স্ট্রাকচার পাইরানোজ ধরনের।	৫. এদের রিং স্ট্রাকচার ফিউরানোজ ধরনের।

□ **ম্যানোজ (Mannose) :** এটি একটি হেক্সোজ। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটি একটি অ্যালডোজ শুগার।

□ **গ্যালাক্টোজ (Galactose) :** এটিও একটি হেক্সোজ। এর আণবিক সংকেত $C_6H_{12}O_6$। এটিও একটি অ্যালডোজ শুগার।

v. হেপ্টোজ (Heptose, $C_7H_{14}O_7$) : সাত কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে হেপ্টোজ বলে। এটি ক্যালভিন চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ। উদাহরণ- সিডোহেপ্টুলোজ, গ্লুকোহেপ্টোজ ইত্যাদি। প্রথমে *Sedum* sp. তে পাওয়া গিয়েছিল বলে এর নাম সিডোহেপ্টুলোজ।

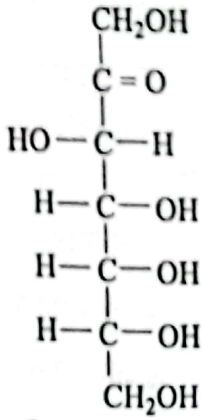
সিডোহেপ্টুলোজ

vi. অক্টোজ (Octose, $C_8H_{16}O_8$) : আট কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে অক্টোজ বলে। উদাহরণ- গ্লুকোঅক্টোজ।

CamScanner

vii. ননোজ (Nonose, $C_9H_{18}O_9$) : নয় কার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে ননোজ বলে। উদাহরণ– গ্লুকোননোজ।

viii. ডেকোজ (Decose, $C_{10}H_{20}O_{10}$) : দশকার্বনবিশিষ্ট মনোস্যাকারাইডকে ডেকোজ বলে। উদাহরণ–গ্লুকোডেকোজ।

আপেক্ষিক মিষ্টতা : সুক্রোজ-১০০; গ্লুকোজ-৭৪; ফ্রুক্টোজ-১৭৩; মল্টোজ-৩২; ল্যাক্টোজ-১৬; স্যাকারিন-৫০০; মন্যালেলিন-২০০০।

২. ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide; গ্রিক. *di* = দুই এবং *saccharin* = চিনি)

দুটি মনোস্যাকারাইড একত্রে যুক্ত হয়ে যে কার্বোহাইড্রেট গঠন করে তাকে ডাইস্যাকারাইড বলে। সুক্রোজ, সেলোবায়োজ, মল্টোজ, ল্যাক্টোজ ইত্যাদি হলো উল্লেখযোগ্য ডাইস্যাকারাইড। ডাইস্যাকারাইডের সাধারণ সংকেত হলো $C_{12}H_{22}O_{11}$।

তিনটি ডাইস্যাকারাইডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : (i) সুক্রোজ, (ii) সেলোবায়োজ, (iii) মল্টোজ

- সুক্রোজ + পানি $\xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}}$ α- D গ্লুকোজ + β - D ফ্রুক্টোজ
- মল্টোজ + পানি $\xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}}$ α- D গ্লুকোজ + α- D গ্লুকোজ
- সেলোবায়োজ + পানি $\xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}}$ β - D গ্লুকোজ + β - D গ্লুকোজ
- ল্যাক্টোজ + পানি $\xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}}$ β - D গ্লুকোজ + β - D গ্যালাক্টোজ

দুই অণু মনোস্যাকারাইডের মধ্যে ঘনীভবন বিক্রিয়ার ফলে দুটো –OH মূলক থেকে এক অণু পানি অপসারিত হলে ডাইস্যাকারাইড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ডাইস্যাকারাইড অণুতে উভয় মনোস্যাকারাইডের C–O–C নতুন বন্ধন সৃষ্টি করে। সৃষ্ট বন্ধনকে (–O–) **গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী** (Glycosidic bond) বলে।

i. সুক্রোজ (Sucrose) : উদ্ভিদের প্রধান ডাইস্যাকারাইড হলো **সুক্রোজ**। এক অণু গ্লুকোজ এবং এক অণু ফ্রুক্টোজ এক সাথে সংযুক্ত হয়ে গঠন করে এক অণু সুক্রোজ। এতে এক অণু পানি সৃষ্টি হয়ে বেরিয়ে যায়। চিনি হলো একটি সাধারণ সুক্রোজ। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$.

উৎস : আখ, বিট, গাজর, আনারস ও মধুগ্রন্থি।

গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ → সুক্রোজ

উৎপত্তি : সবুজ উদ্ভিদের পাতায় প্রস্তুতকৃত কার্বোহাইড্রেট সুক্রোজ হিসেবে বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়। মধুর প্রধান কাঁচামাল হলো সুক্রোজ।

কৌশল : দুটি মনোস্যাকারাইড তথা α – D গ্লুকোজের ১নং কার্বনের –OH এবং β – D ফ্রুক্টোজের ২নং কার্বনের –OH থেকে এক অণু পানি অপসারিত হয়। ফলে কার্বন দুটির মধ্যে একটি গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী বা অক্সিজেন ব্রিজ (– O –) গঠিত হয়ে সুক্রোজ সৃষ্টি হয়।

গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ উভয়ই রিডিউসিং শ্যুগার, কিন্তু সুক্রোজ রিডিউসিং শ্যুগার নয়। কারণ সুক্রোজ তৈরির সময় দুটি মনোস্যাকারাইডের মুক্ত অ্যালডিহাইড ও কিটোন গ্রুপের অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এর বিজারণ ক্ষমতা লুপ্ত হয়। সেজন্য এটিকে বিজারণ ক্ষমতাহীন চিনি বলে।

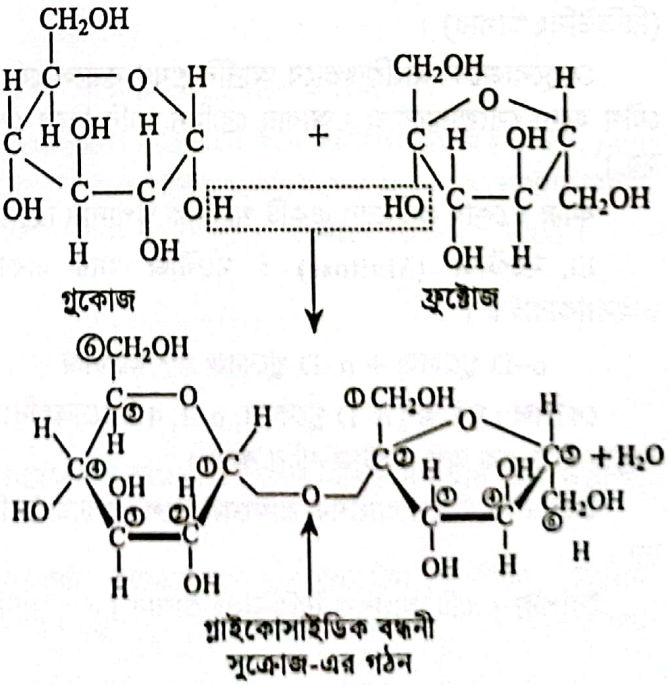

উৎপাদন প্রণালি : ইক্ষুর রসে প্রায় ১৫% সুক্রোজ, কিছু পরিমাণ জৈব এসিড, প্রোটিন ও ফসফেট জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান। সংগৃহীত রসকে পরিস্রুত করার পর তার সাথে কলিচুন মিশালে দ্রবণ থেকে এসিড প্রশমিত হয়, ফসফেট অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং চিনির আর্দ্র-বিশ্লেষণ বন্ধ হয়। অতঃপর রসকে উত্তপ্ত করলে বেশির ভাগ ভেজাল ফেনা ও অধঃক্ষেপ আকারে আলাদা হয়ে যায়। পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পরিষ্কার রসকে নিম্নচাপে ঘনীভূত করলে সুক্রোজ এর স্ফটিক (চিনি) পাওয়া যায়।

বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম : সুক্রোজ সাদা দানাদার, মিষ্টি স্বাদযুক্ত কঠিন পদার্থ। স্বাদে গ্লুকোজ থেকে দ্বিগুণ মিষ্টি, পানিতে দ্রবণীয়, কিন্তু বিশুদ্ধ অ্যালকোহল ও ইথারে অদ্রবণীয়। এর গলনাঙ্ক ১৮৮° সেলসিয়াস। লঘু এসিডে সুক্রোজের জলীয় দ্রবণ আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে সমপরিমাণ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ অণু গঠন করে।

$$\underset{\text{সুক্রোজ}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুক্টোজ}}{C_6H_{12}O_6}$$

কাজ : শ্বসনের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। কোষের বিভিন্ন উপাদান, বিশেষ করে পলিস্যাকারাইড সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার : বিভিন্ন মিষ্টান্ন তৈরিতে এবং কনফেকশনারিতে ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষাগারে অক্সালিক এসিড প্রস্তুতির জন্য এবং স্বচ্ছ সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ii. সেলোবায়োজ (Cellobiose)

সেলোবায়োজ $\xrightarrow{\text{ইমালসিন এনজাইম + অজৈব এসিড}}$ β–D গ্লুকোজ + β–D গ্লুকোজ

উৎস : সেলুলোজ বা লিগনিন এর আংশিক ভাঙ্গনের ফলে সেলোবায়োজ তৈরী হয়।

কৌশল : দুই অণু β–D গ্লুকোজ β–1, 4 লিংকেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে এক অণু সেলোবায়োজ তৈরি করে। কাজেই সেলোবায়োজ একটি ডাইস্যাকারাইড।

বৈশিষ্ট্য : দুটি সদৃশ গ্লুকোজ অণু যুক্ত হয়ে এক অণু সেলোবায়োজ গঠিত হয়। এর আণবিক সংকেত $C_{12}H_{22}O_{11}$। সেলোবায়োজ একটি বিজারণক্ষম চিনি (রিডিউসিং শ্যুগার)।

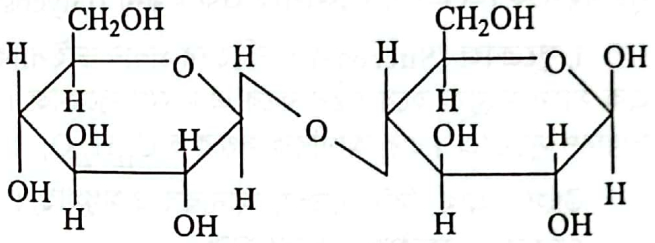

সেলোবায়োজ (β –1, 4 লিংকেজ)

সেলুলোজকে আংশিকভাবে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক (ইউনিট) গঠিত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম যৌগ হলো সেলোবায়োজ। আবার ব্রোমিন পানি দিয়ে সেলোবায়োজকে জারিত করলে সেলোবায়োনিক এসিড তৈরি হয়।

কাজ : কোষ প্রাচীরের একটি গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

***iii.* মল্টোজ (Maltose) :** মল্টোজ আর একটি ডাইস্যাকারাইড।

α–D গ্লুকোজ + α–D গ্লুকোজ → মল্টোজ

কৌশল : *দুই অণু α–D গ্লুকোজ, α–1, 4 লিংকেজ দিয়ে সংযুক্ত হয়ে এক অণু মল্টোজ গঠন করে।*

উৎস : *স্টার্চ-এর আংশিক ভাঙ্গনের ফলে মল্টোজ তৈরি হয়।*

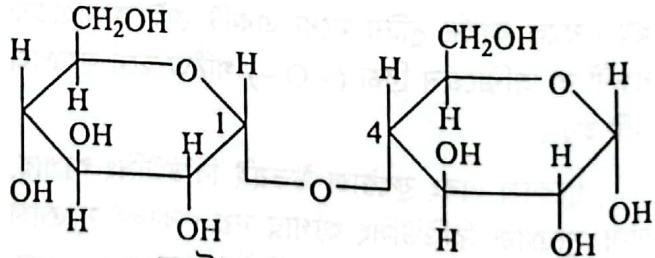

মল্টোজ (α –1, 4 লিংকেজ)

বৈশিষ্ট্য : *এটি আংশিক রিডিউসিং শ্যুগার। এর আণবিক সংকেত* $C_{12}H_{22}O_{11}$.

৩. অলিগোস্যাকারাইড (Oligosaccharides; গ্রিক. *oligo* = স্বল্প *saccharin* = চিনি)

যেসব কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে নির্দিষ্ট সংখ্যক (৩-১০টি) মনোস্যাকারাইড একক পাওয়া যায়, তাদের অলিগোস্যাকারাইড বলে। এক্ষেত্রে মনোস্যাকারাইডগুলো গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন (glycosidic linkage) দিয়ে পরস্পর যুক্ত থাকে। একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রক্সিল গ্রুপের সাথে অন্য একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রক্সিল গ্রুপ যে বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে তাকে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন (–C–O–C) বলে। সাধারণভাবে এরা চিনি (sugar) নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য :

i. স্বাদে মিষ্টি, দানাদার প্রকৃতির।

ii. পানিতে দ্রবণীয়, কেলাস গঠন করে।

iii. অধিকাংশ অলিগোস্যাকারাইড অবিজারক শর্করা, কিন্তু কম সংখ্যক বিজারক শর্করা।

মনোস্যাকারাইড এককের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে অলিগোস্যাকারাইডকে নিম্নোক্তভাবে নামকরণ করা হয়–

i. ট্রাইস্যাকারাইড (Trisaccharides) : তিনটি মনোস্যাকারাইড একক নিয়ে গঠিত কার্বোহাইড্রেটকে ট্রাইস্যাকারাইড বলে। উদাহরণ– র‍্যাফিনোজ ($C_{18}H_{32}O_{16}$), র‍্যাবিনোজ, র‍্যামিনোজ, ম্যালিজিটোজ ইত্যাদি। র‍্যাফিনোজকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে এক অণু গ্লুকোজ, এক অণু ফ্রুক্টোজ ও এক অণু গ্যালাক্টোজ পাওয়া যায়।

$$\text{র‍্যাফিনোজ } (C_{18}H_{32}O_{16}) + \text{পানি } (2H_2O) \xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}} \text{গ্লুকোজ } (C_6H_{12}O_6) + \text{ফ্রুক্টোজ } (C_6H_{12}O_6) + \text{গ্যালাক্টোজ } (C_6H_{12}O_6)$$

ii. টেট্রাস্যাকারাইড (Tetrasccharides) : চারটি মনোস্যাকারাইড একক নিয়ে গঠিত কার্বোহাইড্রেটকে টেট্রাস্যাকারাইড বলে। উদাহরণ– স্ট্যাকায়োজ (গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ + **গ্যালাক্টোজ + গ্যালাক্টোজ**), স্কার্ডোজ ইত্যাদি। কিছু বৃক্ষ প্রজাতিতে স্ট্যাকায়োজ পাওয়া যায়। এদের আণবিক সংকেত ($C_{24}H_{42}O_{21}$)।

$$C_{24}H_{42}O_{21} \text{ (টেট্রাস্যাকারাইড)} + 3H_2O \xrightarrow{\text{আর্দ্রবিশ্লেষণ}} 4C_6H_{12}O_6 \text{ (মনোস্যাকারাইড)}$$

iii. পেন্টাস্যাকারাইড (Pentasaccharides) : পাঁচটি মনোস্যাকারাইড একক নিয়ে গঠিত কার্বোহাইড্রেটকে পেন্টাস্যাকারাইড বলে। উদাহরণ– ভার্বাকোজ। ভার্বাকোজকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে এক অণু গ্লুকোজ, এক অণু ফ্রুক্টোজ ও তিনি অণু গ্যালাক্টোজ পাওয়া যায়।

এভাবে ৬, ৭ বা ৮টি মনোস্যাকারাইড একক থাকলে যথাক্রমে হেক্সাস্যাকারাইড, হেপ্টাস্যাকারাইড, অক্টাস্যাকারাইড ইত্যাদি নামে নামকরণ করা হয়।

৪. পলিস্যাকারাইড (Polysaccharides; গ্রিক. *poly* = বহু এবং *saccharin* = চিনি)

অনেকগুলো মনোস্যাকারাইড একত্রে পলিমারভুক্ত (polymerised) হয়ে গঠন করে **পলিস্যাকারাইড** (গ্রিক. *poly* = many) অন্যভাবে বলা যায়, যে কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে অনেকগুলো (দশের অধিক) মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায় তাকে পলিস্যাকারাইড বলে। এদের আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$, যেখানে $10 > n \geq 3000$।

বৈশিষ্ট্য

i. এরা মিষ্টি নয়, অদানাদার।

ii. পানিতে অদ্রবণীয় এবং কলয়েড ধর্মী।

iii. এরা সবাই অবিজারক শর্করা।

iv. মনোস্যাকারাইডগুলো গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে লম্বা শিকল বিশিষ্ট পলিমার গঠন করে।

v. সাধারণ তাপমাত্রায় আর্দ্রবিশ্লেষিত হয় না।

উদাহরণ– স্টার্চ বা শ্বেতসার, গ্লাইকোজেন, সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, পেকটিন, কাইটিন, ইনুলিন, প্যারামাইলাম, মিউকোপলিস্যাকারাইড, অ্যাগার ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রকৃতিতে সেলুলোজ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, আর স্টার্চের পরিমাণ দ্বিতীয় পর্যায়ে।

CamScanner

ক. গাঠনিক এককের ধরনের ভিত্তিতে পলিস্যাকারাইড দু'ধরনের, যথা–

i. হোমোপলিস্যাকারাইড (Homopolysaccharide) : যেসব পলিস্যাকারাইড একই রকম মনোস্যাকারাইড সমন্বয়ে তৈরি হয়, তাদের হোমোপলিস্যাকারাইড বা হোমোগ্লাইকান বলে। যেমন– স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন, ইনুলিন ইত্যাদি।

ii. হেটেরোপলিস্যাকারাইড (Heteropolysaccharide) : যেসব পলিস্যাকারাইড একাধিক ধরনের মনোস্যাকারাইড সমন্বয়ে তৈরি হয় বা তাদের থেকে উৎপন্ন উপজাত পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়, তাদের হেটেরোপলিস্যাকারাইড বা হেটেরোগ্লাইকান (heteroglycan) বলে। যেমন– হেমিসেলুলোজ, পেকটিন, কাইটিন, মিউকোপলিস্যাকারাইড, অ্যাগার ইত্যাদি।

খ. কাজের ভিত্তিতে পলিস্যাকারাইড তিন ধরনের হয়ে থাকে, যথা–

i. সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড (Storage polysaccharide) : যেসব পলিস্যাকারাইড জীবদেহে সঞ্চিত থেকে শক্তি উৎপাদনে ও জৈব অণু সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়, তাদের সঞ্চিত পলিস্যাকারাইড বলে। যেমন– স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, ইনুলিন, লিভান, প্যারামাইলাম প্রভৃতি।

ii. গঠনগত পলিস্যাকারাইড (Structural polysaccharide) : যেসব পলিস্যাকারাইড কোষের দেহ কাঠামো গঠনে অংশগ্রহণ করে, তাদের গঠনগত পলিস্যাকারাইড বলে। যেমন– সেলুলোজ ও কাইটিন।

iii. মিউকো বস্তু (Muco substances) : মিউসিলেজ, মিউকাস বা পিচ্ছিল বস্তু উৎপাদনক্ষম পলিস্যাকারাইডকে মিউকো বস্তু বলে। যেমন– মিউকোপলিস্যাকাইড বা মিউসিলেজ (mucilage) এবং মিউকোপ্রোটিন বা গ্লাইকোপ্রোটিন (mucoprotein or glycoprotein)। এছাড়াও পেকটিন, হেমিসেলুলোজ, পেপটাইডোগ্লাইকান, লিপোপলিস্যাকারাইড মিউকো বস্তু।

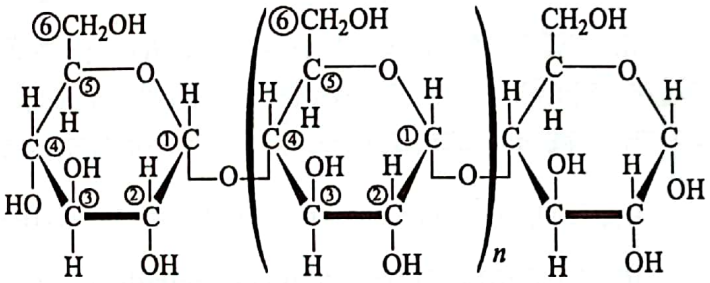

পলিস্যাকারাইড এর গঠন

এখানে কয়েকটি পরিচিত পলিস্যাকারাইড-এর বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. শ্বেতসার বা স্টার্চ (Starch)

অ্যামাইলোজ + অ্যামাইলোপেকটিন = স্টার্চ।

অসংখ্য গ্লুকোজ অণু নিয়ে স্টার্চ গঠিত।

সঞ্চয়ী অঙ্গ : বীজ, ফল, কন্দ।

উৎস : ধান, গম, আলু, ভুট্টা, যব, স্টার্চের প্রধান উৎস।

স্টার্চের ধর্ম (Properties of Starch)

i. স্টার্চ গন্ধহীন, বর্ণহীন, স্বাদহীন এবং সাদা পাউডার জাতীয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ।

ii. সাধারণ তাপমাত্রায় স্টার্চ পানি, ইথার ও অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়। তবে গরম পানিতে এটি দ্রবণীয় হয়ে ওঠে এবং পেস্ট (paste) তৈরি করে।

iii. আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ নীল বর্ণ ধারণ করে।

iv. উচ্চ তাপমাত্রায় স্টার্চ ভেঙ্গে ডেক্সট্রিন ও মল্টোজ হয়ে গ্লুকোজ–এ পরিণত হতে পারে।

v. ফেলিং দ্রবণ স্টার্চ কর্তৃক বিজারিত হয় না।

স্টার্চের আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। স্টার্চের দীর্ঘ অণু বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনের স্থায়ী কণিকা গঠন করে থাকে। স্টার্চ আণুবীক্ষণিক এবং প্রজাতি বিশেষে কণিকার গঠনে পার্থক্য থাকে। যেমন– গোল আলুর স্টার্চ কণিকা সবচেয়ে বৃহত্তম 100 μm আর চালের স্টার্চ কণিকা সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম 2 μm।

CamScanner

গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনের প্রকৃতি অনুযায়ী স্টার্চ দু'প্রকার, যথা– অ্যামাইলোজ ও অ্যামাইলোপেকটিন।

i. **অ্যামাইলোজ (Amylose) :** অ্যামাইলোজে ২০০–১০০০ গ্লুকোজ (D-Glucopyranose) অণুগুলো α বন্ধনের সাহায্যে কার্বনের 1 – 4 স্থানে পরস্পর সংযুক্ত হয়। এর অণুশৃঙ্খল অশাখ। স্টার্চের প্রধান উৎসে ২২% অ্যামাইলোজ থাকে। এর সাথে আয়োডিন যোগ করলে কালবর্ণ (কাল - নীল) ধারণ করে।

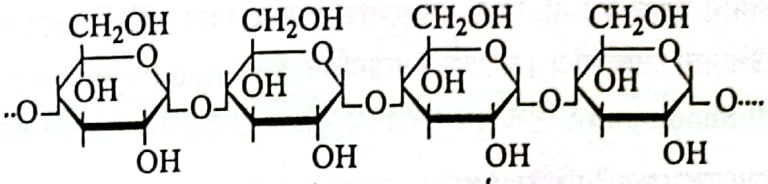

অ্যামাইলোজ-এর গঠন

ii. **অ্যামাইলোপেকটিন (Amylopectin) :** অ্যামাইলোপেকটিনের অণুর শৃঙ্খল শাখান্বিত। অ্যামাইলোপেকটিন সাধারণত 2000 থেকে 2,00,000টি গ্লুকোজ অণুবিশিষ্ট হয়। অ্যামাইলোপেকটিনের গঠনে গ্লুকোজ অণুগুলো কার্বনের 1 – 4 বন্ধন ছাড়াও α – 1 – 6 বন্ধনে যুক্ত থাকে। আলু, ধান, গম, ভূট্টা, যব ইত্যাদির স্টার্চে শতকরা ৭৮ ভাগ অ্যামাইলোপেকটিন থাকে। অ্যামাইলোপেকটিনের সাথে আয়োডিন বিক্রিয়া করে লাল বা পার্পল রং প্রদান করে।

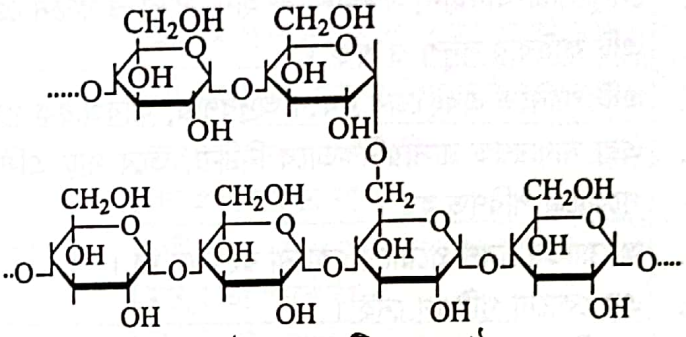

অ্যামাইলোপেকটিন-এর গঠন

আর্দ্রবিশ্লেষণ : লঘু এসিড ও এনজাইম দ্বারা স্টার্চকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করলে প্রথমে ডেক্সট্রিন, পরে মল্টোজ ও শেষে D–গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। যেমন– স্টার্চ $\xrightarrow{H_2O}$ ডেক্সট্রিন $\xrightarrow{H_2O}$ ম্যাল্টোজ $\xrightarrow{H_2O}$ D–গ্লুকোজ

স্টার্চের ব্যবহার ও গুরুত্ব

১. স্টার্চ উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য এবং প্রাণিকুলের প্রধান গৃহীত খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
২. বিশুদ্ধ স্টার্চ গরম পানিতে মিশিয়ে আঠা (glue) তৈরি করা হয়।
৩. পরীক্ষাগারে গ্লুকোজ, অ্যালকোহল ও চোলাই মদ তৈরিতে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়।
৪. অনেক শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়। যেমন–কাগজ শিল্পে এটি ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। তরল 'ক্লথিং স্টার্চ' হিসেবে গার্মেন্টসে ও লন্ড্রিতে এর ব্যবহার রয়েছে।
৫. টাইট্রেশন করার সময় নির্দেশক হিসেবে স্টার্চ ব্যবহৃত হয়।
৬. স্টার্চ গ্লুকোজে পরিণত হয়ে জীবদেহে শক্তি ও কার্বন অণু সরবরাহ করে।

খ. সেলুলোজ (Cellulose)

এটি একটি নিষ্ক্রিয় (inert) পলিস্যাকারাইড। এটি তন্তুময় জটিল হোমোপলিস্যাকারাইড। এর আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। এটি তৃণভোজী প্রাণিদের প্রধান খাদ্য। আমরা শাকসবজি, থোড়, মোচা ইত্যাদির মাধ্যমে সেলুলোজ গ্রহণ করি, যাকে **রাফেজ** (rouphage) বলে। রাফেজ কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। তুলায় 94%, লিলেনে 90%, কাঠে 25–60%, তৃণলতায় 30–40%, পাটে 55–65% আর জৈববস্তু সমৃদ্ধ মাটিতে 40–70% সেলুলোজ থাকে। সেলুলোজ উচ্চ আণবিক ওজনসম্পন্ন সরল ও সোজা শৃঙ্খল, যা অসংখ্য β – D গ্লুকোজ একক (প্রায় 300 – 3000) নিয়ে গঠিত।

কৌশল : β – D গ্লুকোজ অণুগুলো β–1, 4 গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এটি অশাখ পলিমার।

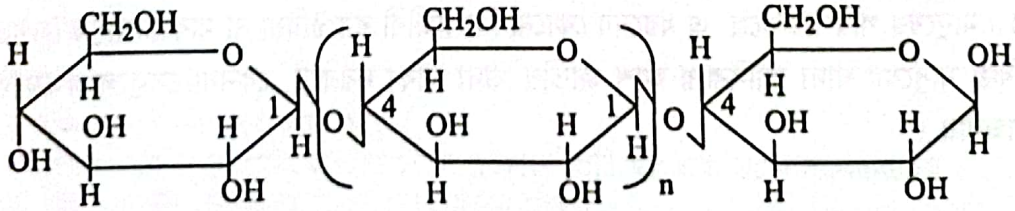

সেলুলোজের গঠন (β –1, 4 লিংকেজ)

মানুষের পরিপাকনালির বিভিন্ন অংশে (মুখগহ্বর, পাকস্থলি ও অন্ত্র) সেলুলেজ এনজাইম না থাকায় সেলুলোজ পদার্থ হজম হয় না; তবে সেলুলোজ গরু-ছাগলে পুষ্টি হিসেবে কাজ করতে পারে। বস্ত্র ও আসবাবপত্র শিল্পের প্রধান উপাদান সেলুলোজ। ফরাসি রসায়নবিদ **Anselme Payen** ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে সেলুলোজ আবিষ্কার করেন। **Kobayashi ও Shode** ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম কৃত্রিম সেলুলোজ সংশ্লেষ করেন।

সেলুলোজের বৈশিষ্ট্য / ধর্ম

১. সেলুলোজ স্বাদহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন, সাদা ও কঠিন জৈব যৌগ।
২. এটি ফাইবার সদৃশ ও শক্ত।
৩. এটি পানিতে এবং জৈব দ্রবণে অদ্রবণীয়, অবিজারক পদার্থ।
৪. এরা সাধারণত রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়, তবে গাঢ় এসিড (H_2SO_4 বা HCl) বা NaOH দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়।
৫. আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগে কোনো রং দেয় না।
৭. এর কোনো পুষ্টিগুণ নেই।
৮. আণবিক ভর দুই লক্ষ থেকে কয়েক লক্ষ।

সেলুলোজের কাজ

১. উদ্ভিদের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।
২. উদ্ভিদকে দৃঢ়তা ও সুরক্ষা প্রদান করে এবং ভার বহন করে।
৩. সেলুলোজ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সেলুলোজের ব্যবহার : (i) উদ্ভিদের **কোষপ্রাচীর** সেলুলোজ নির্মিত। (ii) সেলুলোজ দিয়ে **তন্তু** তৈরি হয়, যা বস্ত্র শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। (iii) মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহৃত কাঠ, বাঁশ কাগজ, কার্ডবোর্ড তৈরির প্রধান উপাদান হলো উদ্ভিজ্জ সেলুলোজ। (iv) স্বচ্ছ ও পাতলা ফিল্ম **সেলোফেন** (cellophane) এবং কাপড়ের কাঁচামাল **রেয়ন** (rayon) সেলুলোজ হতে তৈরি হয়। (v) ধোঁয়াবিহীন বিস্ফোরক **নাইট্রোসেলুলোজ** (nitrocellulose) উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল হলো সেলুলোজ। (vi) ফটোগ্রাফিক এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের **সেলুলয়েড** (celluloid) তৈরিতে উদ্ভিদের সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়। (vii) পানিতে দ্রবণীয় আঠা **মিথাইল সেলুলোজ** (methyl cellulose) তৈরিতে সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়। (viii) থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফিতে **স্টেশনারি ফেজ** (stationary phase) হিসেবে সেলুলোজ ব্যবহৃত হয়। (ix) নিউজপ্রিন্ট কাগজকে রিসাইক্লিং করে তৈরি করা **সেলুলোজ ইনসুলেটর** (cellulose insulator) একটি পরিবেশবান্ধব আবরক। (x) গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (xi) ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপাদিত সেলুলোজ বর্তমানে বায়োটেকনোলজিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মানুষ সেলুলোজ হজম করতে পারে না কেন ?

স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিপাকতন্ত্রে সেলুলোজ হজমকারী এনজাইম তৈরি হয় না। তৃণভোজী স্তন্যপায়ী যেমন– গরু, ছাগল, মহিষ, হরিণ ইত্যাদির পরিপাকতন্ত্রে এক ধরনের মিথোজীবী ব্যাক্টেরিয়া বাস করে যারা সেলুলোজ হজমকারী এনজাইম সেলুলেজ উৎপাদন করে। সেলুলেজে বিদ্যমান β–1–4 গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ ভেঙ্গে সেলুলোজকে হজমে সাহায্য করে। মানুষের পরিপাকতন্ত্রে এ ধরনের কোনো মিথোজীবী ব্যাক্টেরিয়া না থাকায় মানুষ সেলুলোজ হজম করতে পারে না। কিন্তু মানুষের খাদ্য তালিকায় আঁশ জাতীয় খাদ্য থাকা দরকার, কেননা সেলুলোজ কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

CamScanner

স্টার্চ ও সেলুলোজ এর মধ্যে পার্থক্য		
পার্থক্যের বিষয়	স্টার্চ	সেলুলোজ
১. গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন	স্টার্চ অণুতে প্রায় ১,২০০ থেকে ৬,০০০ গ্লুকোজ একক α– গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।	সেলুলোজে প্রায় ৩০০ থেকে ৩০০০ গ্লুকোজ একক α– গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।
২. পলিমার	এটি হলো α–D গ্লুকোজ পলিমার।	এটি হলো β –D গ্লুকোজ পলিমার।
৩. পলিমারের গঠন	এটি অপেক্ষাকৃত জটিল ও শাখান্বিত পলিমার।	এটি অপেক্ষাকৃত সরল ও অশাখ পলিমার।
৪. সঞ্চিত খাদ্য	উদ্ভিদদেহে এটি সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে থাকে।	উদ্ভিদদেহে এটি গাঠনিক উপাদান হিসেবে থাকে।
৫. বর্ণ	আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে নীল বর্ণ প্রদান করে।	আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে কোনো বর্ণ প্রদান করে না।
৬. হজম	এটি গরু-ছাগল ও মানুষ হজম করতে পারে।	এটি গরু-ছাগল হজম করতে পারলেও মানুষ তা পারে না।
৭. ব্যবহার	প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ. গ্লাইকোজেন (Glycogen)

এটি এক ধরনের পুষ্টিজাত পলিস্যাকারাইড। এর আণবিক সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। গ্লাইকোজেন প্রাণিদেহের প্রধান সঞ্চিত খাদ্য উপাদান হওয়াতে একে **প্রাণিজ স্টার্চ** (animal starch) বলা হয়। প্রাণিদের **যকৃত** ও **পেশিতে** গ্লাইকোজেন সঞ্চিত থাকে। গ্লুকোজের উৎস হলো গ্লাইকোজেন। সবুজ উদ্ভিদে গ্লাইকোজেন সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকলেও সায়ানোব্যাকটেরিয়া এবং কতিপয় ছত্রাকে (ঈস্ট) সঞ্চিত খাদ্যরূপে গ্লাইকোজেন উপস্থিত থাকে। গ্লাইকোজেনের গঠন অ্যামাইলোপেকটিনের মতো তবে শৃঙ্খলগুলো শাখান্বিত। α–1, 6 লিংকেজের মাধ্যমে শাখার সৃষ্টি করে। এর মূল গাঠনিক একক হলো α–D গ্লুকোজ। এর প্রতি শাখায় সাধারণত 10-20 টি α–D গ্লুকোজ একক থাকে। α–D গ্লুকোজ অণুগুলো α–1, 4 গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে।

ফরাসি শারীরতত্ত্ববিদ **Claude Bernard** ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে গ্লাইকোজেন আবিষ্কার করেন।

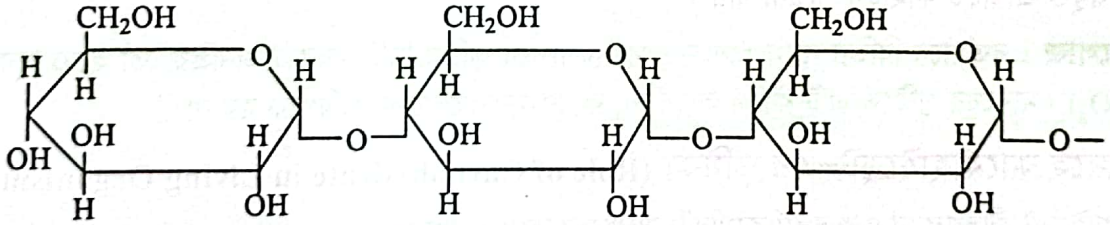

গ্লাইকোজেন অণুর একাংশ (α -1, 4 লিংকেজ)। চিত্রে α -1, 6 লিংকেজ শাখা দেখানো হয়নি।

গ্লাইকোজেনের ধর্ম (Properties of glycogen)

(i) গ্লাইকোজেন পানিতে আংশিক দ্রবণীয়। (ii) এটি সাদা পাউডার জাতীয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ। (iii) আয়োডিন দ্রবণে লালচে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। (iv) ঠাণ্ডা পানিতে এটি কলয়েড সাসপেনশন তৈরি করে। (v) তাপ দিলে এর লাল বর্ণ চলে যায়। (vi) ঠাণ্ডা অবস্থায় কালো বর্ণ ফিরে আসে। (vii) আংশিক আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে মল্টোজ, আর পূর্ণ আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে α–D গ্লুকোজ অণু প্রদান করে। (viii) গ্লাইকোজেন গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ অণু সৃষ্টি করে। (ix) যকৃতের গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয় এবং রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

গ্লাইকোজেনের ব্যবহার ও গুরুত্ব

১. এটি প্রাণিদেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কাজ করে।
২. রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং রক্তে সরবরাহ হয়।
৩. পেশিতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন পেশির কাজে শক্তির যোগান দেয়।
৪. এটি রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

● **বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিন্যাস**

বিজারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেট দু'প্রকার। যথা–

১. **রিডিউসিং শ্যুগার বা বিজারক শর্করা :** যেসব কার্বোহাইড্রেটে কমপক্ষে একটি মুক্ত অ্যালডিহাইড (–CHO) বা কিটোন (=CO) গ্রুপ থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে তাদেরকে **রিডিউসিং শ্যুগার বা বিজারক শর্করা** বলে। যেন– গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ প্রভৃতি। এরা বেনেডিক্ট দ্রবণ ও ফেহলিং দ্রবণ দ্বারা বিজারিত হয়।

২. **নন-রিডিউসিং শ্যুগার বা অবিজারক শর্করা :** যেসব কার্বোহাইড্রেটে একটিও মুক্ত অ্যালডিহাইড (–CHO) বা কিটোন (=CO) গ্রুপ না থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজারিত করতে পারে না তাদেরকে **নন-রিডিউসিং শ্যুগার বা অবিজারক শর্করা** বলে। যেমন– সুক্রোজ, ট্রিহ্যালোজ, পলিস্যাকারাইড প্রভৃতি। সুক্রোজ α–D গ্লুকোজের ১নং কার্বনের OH এবং β–D ফ্রুক্টোজের ২নং কার্বনের OH থেকে এক অণু পানি অপসারিত হয়ে একটি অক্সিজেন ব্রিজ (–O–) তৈরি হয়। এর ফলে এদের মুক্ত –CHO বা C = O গ্রুপ থাকে না। এদেরকে প্রাথমিক অবস্থায় আর্দ্রবিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। এরপর অন্য যৌগকে বিজারিত করতে পারে।

❖ **হেমিসেলুলোজ (Hemicellulose) :** উদ্ভিদের কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ এবং পেকটিন পদার্থ ব্যতীত অন্যান্য পলিস্যাকারাইডকে হেমিসেলুলোজ বলে। যেমন– জাইলান, গ্লুকান, মানান ইত্যাদি।

❖ **কাইটিন (Chitin) :** এটি নাইট্রোজেনবিশিষ্ট পলিস্যাকারাইড। এটি পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে থাকা দ্রব্যের একটি। পতঙ্গ, কাঁকড়া, লোবস্টার ইত্যাদির বহিঃকঙ্কালে এবং ছত্রাকের কোষপ্রাচীরে কাইটিন থাকে।

কার্বোহাইড্রেটে ডেরিভেটিভস

কার্বোহাইড্রেটের মূল গঠনে রাসায়নিক পরিবর্তন বা কোনো কার্যকর গ্রুপ যুক্ত হয়ে যে নতুন যৌগ গঠিত হয় তাকে **কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভ** বলে। শ্যুগারের হাইড্রোক্সিল গ্রুপ (–OH) অ্যামিনো গ্রুপ ($–NH_2$) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভ সৃষ্টি হয়, যেমন– গ্লুকোসামিন, গ্যালাক্টোসামিন ইত্যাদি। তরুণাস্থির প্রধান দ্রব্য হচ্ছে গ্যালাক্টোসামিন। গ্লুকোসামিন পলিমার হয়ে কাইটিন গঠন করে, অর্থাৎ কাইটিনের মনোমার হচ্ছে গ্লুকোসামিন। ছত্রাক ও সন্ধিযুক্ত প্রাণীতে কাইটিন পাওয়া যায়।

সুকরালোজ : বর্তমানে বিভিন্ন নামে (যেমন– Zerocal) যে কৃত্রিম মিষ্টিকারকটি জনপ্রিয়, তা হচ্ছে **সুকরালোজ** ($C_{12}H_{19}Cl_3O_8$)। মানুষের পুষ্টিতে এটি কাজে আসে না, কারণ-সুকরালোজের পরিপাক হয় না।]

জীবদেহে কার্বোহাইড্রেট–এর ভূমিকা (Role of Carbohydrate in Living Organisms)

কার্বোহাইড্রেট জীবদেহের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে। যেমন–

১. **শক্তির প্রধান উৎস :** জীবদেহে শক্তির প্রধান উৎস হলো কার্বোহাইড্রেট। এটি দেহে **বায়ো-ফুয়েল** (bio-fuel) বা **জৈব জ্বালানি** হিসেবে কাজ করে। সবাত শ্বসনে কার্বোহাইড্রেট অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি করে, ফলে কোষে শক্তি সরবরাহ হতে থাকে। দেহে খাদ্য থেকে আগত শক্তির ৫০–৮০% ই আসে কার্বোহাইড্রেট থেকে। এর সরবরাহকৃত শক্তির পরিমাণ 4.1 KCal/gm।

২. **গাঠনিক উপাদান :** কার্বোহাইড্রেট উদ্ভিদের সাপোর্টি টিস্যুর গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

৩. **সঞ্চিত খাদ্য :** উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে বিভিন্ন রূপে কার্বোহাইড্রেট সঞ্চিত থাকে। যেমন–

i. উদ্ভিদের বীজ, ফল ও কন্দে কার্বোহাইড্রেট **স্টার্চ** (starch) রূপে কোষে বিরাজ করে।

ii. প্রাণিদেহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট **গ্লাইকোজেন** (glycogen) হিসেবে যকৃত ও পেশিতে সঞ্চিত থাকে।

iii. ডালিয়া, চিকোরি, পিঁয়াজ ও রসুনে কার্বোহাইড্রেট **ইনুলিন** (inulin) রূপে সঞ্চিত থাকে।

৪. **কার্বন কাঠামো :** উদ্ভিদদেহ গঠনকারী পদার্থগুলোর কার্বন কাঠামো (carbon skeleton) প্রদান করে।

CamScanner

৫. **বিভিন্ন চক্রে :** ক্যালভিন চক্র, ক্রেবস চক্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ চক্রে কার্বোহাইড্রেট সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
৬. **কো-এনজাইমে :** বিভিন্ন প্রকার কো-এনজাইম, যেমন–ATP, NADP, FAD ইত্যাদির গাঠনিক অংশ হিসেবে অবস্থান করে।
৭. **কোষপ্রাচীর :** সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, কাইটিন, পেকটিন ইত্যাদি পদার্থ কোষপ্রাচীরের প্রধান উপাদান।
৮. **নিউক্লিক এসিড :** নিউক্লিক এসিডের অন্যতম উপাদান রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ হলো পেন্টোজ জাতীয় শর্করা।
৯. **দেহতৈরি ও মেরামত :** কার্বোহাইড্রেট দেহে বাড়তি প্রোটিন যোগানের মাধ্যমে দেহতৈরি ও মেরামতের কাজে সহায়তা করে।
১০. **হাড়ের সন্ধিস্থলে :** প্রাণিদেহে হাড়ের সন্ধিস্থলে পিচ্ছিল পদার্থ বা **লুব্রিকেন্ট** (lubricant) হিসেবেও কিছু কার্বোহাইড্রেট (যেমন– হায়ালোরনিক এসিড) ভূমিকা পালন করে।
১১. **মৌলিক চাহিদা :** মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় এর অনেক উপাদান কার্বোহাইড্রেট থেকেই আসে।
১২. **কাগজ :** আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম বাহন কাগজ তৈরি হয় কার্বোহাইড্রেট থেকে।
১৩ **রক্তজমাট প্রতিরোধক : হেপারিন** (heparin) নামক পলিস্যাকারাইড রক্তে **অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর** (anticoagulant factor) হিসেবে বিদ্যমান থেকে রক্তনালিকার অভ্যন্তরে রক্ত জমাট প্রতিরোধ করে।
১৪. **অ্যান্টিজেন :** অনেক অ্যান্টিজেন গ্লাইকোপ্রোটিন নির্মিত যারা সর্বদা রক্তের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
১৫. **হরমোন ও প্রজনন :** অনেক হরমোন যেমন– FSH (Follicular Stimulating Hormone) ও LH (Leutinizing Hormone) গ্লাইকোপ্রোটিন নির্মিত যারা প্রাণীর প্রজননে অংশগ্রহণ করে।
১৬. **অন্ত্রে ভূমিকা :** কার্বোহাইড্রেট অন্ত্রের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন– ল্যাক্টোজ ক্ষুদ্রান্ত্রের কিছু ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। এসব ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন B-কমপ্লেক্স সংশ্লেষণে ভূমিকা রাখে।
১৭. **ফ্যাট অক্সিডেশন :** ফ্যাক্ট অক্সিডেশনের জন্য কার্বোহাইড্রেট অপরিহার্য। এর অনুপস্থিতিতে ফ্যাট অক্সিডেশন সম্ভব নয়।
১৮. **পেরিস্ট্যালসিস :** ল্যাক্টোজ ক্যালসিয়াম শোষণ কার্যকে ত্বরান্বিত করে, সেলুলোজ দ্বারা সরবরাহকৃত তন্তু অন্ত্রের পেরিস্ট্যালসিস প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে।

অ্যামিনো এসিড (Amino Acids)

বিজ্ঞানী **Emil Fischer** ও **Franz Hofmeister** (1902) অ্যামিনো এসিড নামকরণ করেন। অ্যামিনো এসিড হলো প্রোটিনের মূল গাঠনিক একক। কোনো জৈব এসিডের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) দ্বারা প্রতিস্থাপনের ফলে যে জৈব এসিড উৎপন্ন হয় তাকে অ্যামিনো এসিড বলা হয়। কাজেই প্রতিটি অ্যামিনো এসিডে কমপক্ষে একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ (–COOH) এবং একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) থাকে। **তাই বলা যায়, অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) ও কার্বোক্সিল গ্রুপ [(–COOH) যুক্ত যে জৈব এসিড থেকে প্রোটিন তৈরি হয় তাকে অ্যামিনো এসিড বলে।**

উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো এসিড আছে। এর মধ্যে বিশ প্রকার অ্যামিনো এসিড বিভিন্নভাবে সমন্বিত ও সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন রকম প্রোটিন তৈরি করে।

প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো এসিডের সাধারণ গঠন

অ্যামিনো এসিড এর কার্বক্সিল গ্রুপ এর নিকটবর্তী কার্বন-পরমাণুটিকে α- কার্বন বলা হয় এবং কার্বক্সিল গ্রুপটি α-কার্বনের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে α-অ্যামিনো এসিড বলা হয়।

অ্যামিনো এসিডের রাসায়নিক গঠন: অ্যামিনো এসিডের সাধারণ রাসায়নিক সংকেত হলো $R\text{-}CH.NH_2.COOH$। এখানে R হলো একটি হাইড্রোজেন

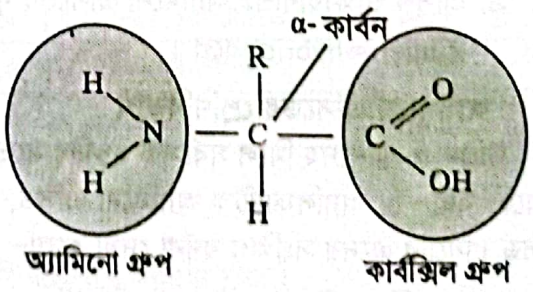

চিত্র ৩.২ : অ্যামিনো এসিডের গঠন

পরমাণু বা কার্বনযুক্ত কোনো জৈব যৌগ। অ্যামিনো এসিডে অন্তত একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$), একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ ($-COOH$) এবং একটি পার্শ্বশিকল গ্রুপ (R) থাকে। তবে কোনো কোনো অ্যামিনো এসিডে ২টি অ্যামিনো গ্রুপ কিংবা ২টি কার্বোক্সিল গ্রুপ কিংবা সালফার থাকতে পারে। প্রকৃতিতে বেশির ভাগ অ্যামিনো এসিডই α-অ্যামিনো এসিড।

অ্যামিনো এসিডের সাধারণ গঠন : 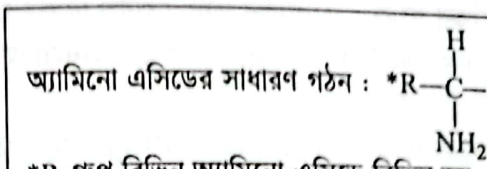

*R-গ্রুপ বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডে বিভিন্ন হয়

α- কার্বনে সংযুক্ত R-গ্রুপ বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডে বিভিন্ন রকম হয়, যেমন–

R-গ্রুপ H-হলে অ্যামিনো এসিড গ্লাইসিন 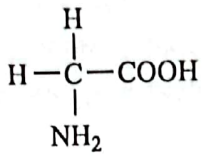
গ্লাইসিন

R-গ্রুপ CH_3-হলে অ্যামিনো এসিড এলানিন 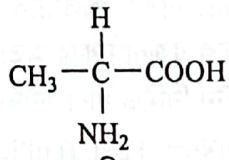
এলানিন

R-গ্রুপ CH_2OH-হলে অ্যামিনো এসিড সেরিন 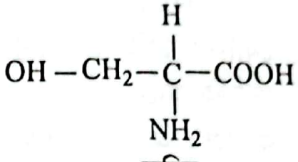
সেরিন

R-গ্রুপ CH_2SH-হলে অ্যামিনো এসিড সিস্টিন 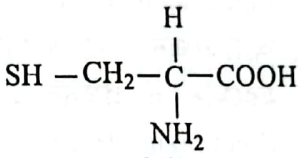
সিস্টিন

কোনো কোনো অ্যামিনো এসিডে ২টি অ্যামিনো গ্রুপ, আবার কোনো কোনো অ্যামিনো এসিডে ২টি কার্বক্সিল গ্রুপ থাকতে পারে। আবার কোনো কোনো অ্যামিনো এসিডে সালফার থাকতে পারে।

অ্যামিনো এসিডের বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি অ্যামিনো এসিডে একটি কেন্দ্রীয় কার্বনকে ঘিরে–
(i) একটি অ্যামিনো গ্রুপ
(ii) একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ
(iii) একটি হাইড্রোজেন এবং
(iv) একটি R-গ্রুপ থাকে।

১. মানবদেহের প্রায় সব অ্যামিনো এসিডই α-অ্যামিনো এসিড।
২. এরা পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।
৩. এরা স্বাদহীন, মিষ্টি বা তিক্ত পদার্থ।
৪. এরা বর্ণহীন, স্ফটিকাকার পদার্থ।
৫. মৃদু এসিড বা ক্ষারে অ্যামিনো এসিড লবণ সৃষ্টি করে।
৬. এরা উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট।
৭. বিশুদ্ধ প্রোটিনকে কোনো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা এনজাইম এর সাহায্যে সম্পূর্ণ হাইড্রোলাইসিস (আর্দ্র-বিশ্লেষণ) করলে অ্যামিনো এসিড পাওয়া যায়।
৮. এক বা একাধিক ধরনের অ্যামিনো এসিড পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে প্রোটিন গঠন করে।
৯. এসিড ও ক্ষারবিশিষ্ট অ্যামিনো এসিডের মূলককে **জুইটার আয়ন** (Zuitter Ions; Zuitter = hybrid) বলে।

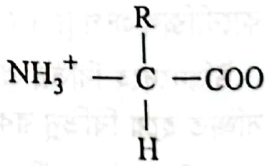
জুইটার আয়ন

অ্যামিনো এসিডের শ্রেণিবিভাগ

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ মিলে সর্বমোট ২৮টির মতো অ্যামিনো এসিড রয়েছে। এগুলোকে মোটামুটি ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা– ১. অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো এসিড, ২. অ্যারোমেটিক অ্যামিনো এসিড ও ৩. হেটেরোসাইক্লিক অ্যামিনো এসিড। নিচের এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো–

১. অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো এসিড : অ্যামিনো এসিডের পার্শ্বশিকল গ্রুপটি (R-গ্রুপ) অ্যালিফ্যাটিক যৌগের হলে তাকে **অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনো এসিড** বলে। যেমন– গ্লাইসিন, অ্যালানিন, ভ্যালিন।

২. **অ্যারোমেটিক অ্যামিনো এসিড :** অ্যামিনো এসিডের পার্শ্বশিকল গ্রুপটি (R-গ্রুপ) অ্যারোমেটিক যৌগের হলে তাকে অ্যারোমেটিক অ্যামিনো এসিড বলে। যেমন– ফিনাইল অ্যালানিন, টাইরোসিন।

৩. **হেটেরোসাইক্লিক অ্যামিনো এসিড :** যে অ্যামিনো এসিডে অ্যালিফ্যাটিক ও অ্যারোমেটিক অ্যামিনো এসিডের বিপরীত ধর্ম পরিলক্ষিত হয় তাকে **হেটেরোসাইক্লিক অ্যামিনো এসিড** বলে। যেমন– ট্রিপটোফ্যান, প্রোলিন, হিস্টিডিন।

পোলার এবং নন-পোলার অ্যামিনো এসিড

i. নন-পোলার = ১০টি, যেমন– অ্যালানিন, ভ্যালিন
ii. পোলার-আনচার্জড = ৫টি, যেমন– সেরিন, থ্রিওনিন
iii. পোলার – নেগেটিভ চার্জড = ২টি, যেমন– গ্লুটামিক এসিড
iv. পোলার–পজিটিভ চার্জড = ৩টি, যেমন– লাইসিন, হিস্টিডিন

প্রোটিন গঠনের ভিত্তিতে : অ্যামিনো এসিড দু'ধরনের, যথা–

১. **প্রোটিন অ্যামিনো এসিড :** সাধারণত ২০টি অ্যামিনো এসিড বিভিন্ন প্রোটিন গঠনে অংশগ্রহণ করে। এদেরকে বলা হয় প্রোটিন অ্যামিনো এসিড। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো– লিউসিন, ভ্যালিন, লাইসিন, আরজিনিন, টাইরোসিন ইত্যাদি।

২. **নন-প্রোটিন অ্যামিনো এসিড :** যেসব অ্যামিনো এসিড প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে না তাদের নন-প্রোটিন অ্যামিনো এসিড বলে। অরনিথিন, সাইট্রুলিন, হেমোসেরিন, হেমোসিস্টাইন প্রভৃতি নন-প্রোটিন অ্যামিনো এসিড। এদের কিছু (যেমন–অরনিথিন) ইউরিয়া সংশ্লেষণে এবং কিছু (যেমন– হেমোসেরিন) প্রোটিন অ্যামিনো এসিড সংশ্লেষণে ভূমিকা রাখে। প্রোটিনে **হাইড্রোক্সিপ্রোলিনের** উপস্থিতি খুবই সীমিত, তাই একে **বিরল অ্যামিনো এসিড** বলে।

খাদ্যে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে অ্যামিনো এসিড দুই ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. **অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড :** এরা দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হয় না। উদাহরণ– লিউসিন, আইসোলিউসিন, লাইসিন, থ্রিওনিন, ভ্যালিন, মেথিওনিন, ফিনাইল অ্যালানিন এবং ট্রিপটোফ্যান (৮টি)। শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড ১০টি, আরজিনিন ও হিস্টিড়িন হলো অতি গুরুত্বপূর্ণ।

২০টি অ্যামিনো এসিডের নামের তালিকা

	অ্যামিনো এসিড	সংক্ষিপ্ত নাম	
১	লিউসিন	Leu	L
২	আইসোলিউসিন	Ileu	I
৩	লাইসিন	Lys	K
৪	মেথিওনিন	Met	M
৫	ভ্যালিন	Val	V
৬	সেরিন	Ser	S
৭	প্রোলিন	Pro	P
৮	থ্রিওনিন	Thr	T
৯	অ্যালানিন	Ala	A
১০	টাইরোসিন	Tyr	Y

	অ্যামিনো এসিড	সংক্ষিপ্ত নাম	
১১	হিস্টিডিন	His	H
১২	অ্যাসপারাজিন	Asn	N
১৩	সিস্টিন	Cys	C
১৪	আরজিনিন	Arg	R
১৫	গ্লাইসিন	Gly	G
১৬	ট্রিপ্টোফ্যান	Trp	W
১৭	গ্লুটামিন	Gln	O
১৮	গ্লুটামিক এসিড	Glu	E
১৯	অ্যাসপারটিক এসিড	Asp	D
২০	ফিনাইল অ্যালানিন	Phe	I

অ্যামিনো এসিডের কাজ

১. প্রোটিন সংশ্লেষ করা।
২. ইউরিয়া সংশ্লেষে সাহায্য করা।
৩. কিছু ভিটামিন, হরমোন (ইনডোল), এনজাইম, অ্যান্টিবডি সংশ্লেষে সাহায্য করা।

CamScanner

৪. ভিটামিন নিকোটিনামাইড, উদ্ভিদ হরমোন ইন্ডোল অ্যাসিটিক এসিড (IAA) গঠনে অংশগ্রহণ করে।
৫. অ্যামিনো গ্রুপের অপসারণে বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডের কার্বন শৃঙ্খল গ্লুকোজ গঠন করে।
৬. যদি কার্বক্সিল গ্রুপ CO_2 হিসেবে অপসৃত হয় তখন অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো গঠন করে। যেমন– হিস্টামিন।
৭. জীবদেহ গঠনে সাহায্য করে।
৮. দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
৯. দেহে p^H নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
১০. মেলানিন রঞ্জক সৃষ্টিতে সাহায্য করে (চুল ও চোখের কোরাকয়েড স্তরে)।

প্রোটিন (Protein) বা আমিষ

জীবদেহ গঠনে প্রোটিনই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ থাকে। কোষের শুষ্ক ওজনের প্রায় 50% প্রোটিন। গ্রিক. *'proteios'* হতে *Protein* শব্দের উৎপত্তি। *'Proteios'* অর্থ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিন জীবদেহের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থ। বিভিন্ন অ্যামিনো এসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন অণু গঠন করে। প্রোটিন শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন **জি. মুল্ডার** (G.Mulder) ১৮৩৯ সালে।

প্রোটিনকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যেমন–

- অ্যামিনো এসিডের পলিমারকে প্রোটিন বা আমিষ বলে।
- অ্যামিনো এসিডের মনোমার পেপটাইড বন্ধনী দিয়ে পরস্পর আবদ্ধ হয়ে যে জটিল জৈব যৌগ (পলিমার) গঠন করে তাকে প্রোটিন বলে।
- প্রোটিন হলো উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট বৃহৎ অণুর জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো এসিড উৎপন্ন করে।
- পেপটাইড বন্ধনে আবদ্ধ পলিপেপটাইড শিকলে যখন অ্যামিনো এসিডের অণুর সংখ্যা শতাধিক হয় তখন অ্যামিনো এসিডের এই পলিমারকে প্রোটিন বলে।

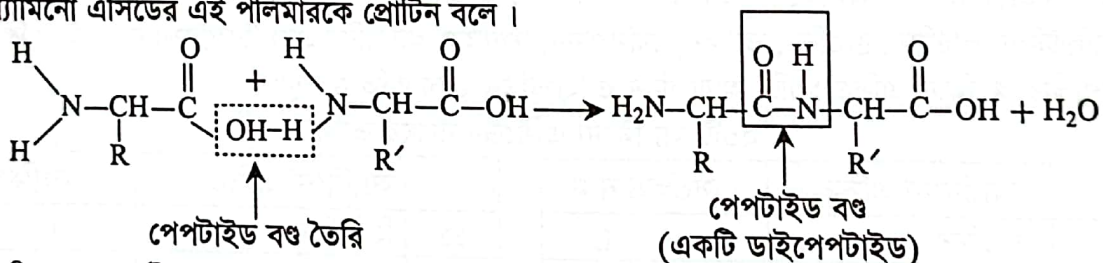

১টি অ্যামিনো এসিডের OH (কার্বক্সিল গ্রুপের) এবং অপর ১টি অ্যামিনো এসিডের H (অ্যামিনো গ্রুপের) যুক্ত হয়ে পানি বের হয়ে যায় এবং C – N বন্ধন তৈরি হয়।

সংশ্লেষণ স্থান : কোষের রাইবোজোমে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

উৎস : প্রায় সকল ধরনের খাদ্যেই কিছু না কিছু প্রোটিন থাকে। তবে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা প্রভৃতিতে প্রাণিজ প্রোটিন এবং বাদাম, সয়াবিন, ডাল, যব, ভুট্টা, আলু, গম, বিভিন্ন ফল ইত্যাদিতে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন থাকে।

প্রোটিনের বিস্তার : জীবদেহের প্রায় সর্বত্র প্রোটিন বিরাজমান। জীবদেহের সকল অঙ্গে গাঠনিক বস্তু হিসেবে প্রোটিন বিদ্যমান, জীবদেহের বিভিন্ন জৈবনিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন এনজাইম, হরমোন, অ্যান্টিবডি প্রভৃতি প্রোটিন দিয়ে তৈরি। **সব এনজাইম প্রোটিন কিন্তু সব প্রোটিন এনজাইম নয়।**

গঠন : বিভিন্ন অ্যামিনো এসিড বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে এক একটি প্রোটিন গঠন করে। **একটি অ্যামিনো এসিডের কার্বোক্সিল গ্রুপ (–COOH) অপর একটি অ্যামিনো এসিডের α–অ্যামাইনো গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে যে অ্যামাইড বন্ড গঠন করে তাকে পেপটাইড বন্ড (peptide bond) বলে।** প্রতিটি পেপটাইড বন্ড তৈরিতে এক অণু পানি নির্গত হয়। দুটি ভিন্ন অ্যামিনো এসিড যুক্ত হয়ে গঠন করে ডাইপেপটাইড, তিনটি যুক্ত হয়ে গঠন করে ট্রাইপেপটাইড, চার থেকে দশটি সংযুক্ত হয়ে গঠন করে অলিগোপেপটাইড। বিভিন্ন অ্যামিনো এসিডের প্রায় ৫০টি অণু পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পলিপেপটাইড সৃষ্টি করে। প্রোটিন হলো পলিপেপটাইড যৌগ।

CamScanner

প্রোটিনে সাধারণত 100–400টি অ্যামিনো এসিড থাকে। ইনসুলিন নামক ক্ষুদ্রতম প্রোটিনে 51টি অ্যামিনো এসিড থাকে এবং বৃহৎ প্রোটিনে 40,000টি অ্যামিনো এসিড যুক্ত থাকতে পারে। মানুষের সেরাম অ্যালবুমিন (setrum albumin) নামক প্রোটিন থাকে, যা 582টি অ্যামিনো এসিড দ্বারা গঠিত।

পেপটাইড : এ বন্ড দ্বারা যুক্ত হয়ে অ্যামিনো এসিডের একটি শিকল গঠন করে।

পলিপেপটাইড : এতে ৫০টির অধিক অ্যামিনো এসিড থাকে।

প্রোটিন : এক বা একাধিক পলিপেটাইড যা ফোল্ডেড হয়ে নির্দিষ্ট থ্রিডাইমেনশনাল আকৃতি প্রাপ্ত হয়। কেবলমাত্র ফোল্ডেড অবস্থা প্রাপ্ত হলেই প্রোটিন কার্যকরী হয়।

এক পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন = লাইসোজাইম
দুই পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন = ইনটোগ্রিন
তিন পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন = কোলাজেন
চার পলিপেপটাইড দ্বারা গঠিত প্রোটিন = হিমোগ্লোবিন

কাঠামোগত ভিন্নতা

জীবদেহে অসংখ্য ধরনের প্রোটিন থাকে। জীবদেহে যত সংখ্যক জিনের প্রকাশ ঘটে ঐ দেহে কমপক্ষে তত ধরনের প্রোটিন থাকে। কাজেই হাজার হাজার ধরনের প্রোটিন একটি জীবদেহে থাকে। আবার দুটি প্রজাতির মধ্যে যেহেতু জিনগত পার্থক্য থাকে, সেহেতু এদের মধ্যে প্রোটিনের ভিন্নতা থাকে। একই প্রজাতির দুটি জীবের কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে, কাজেই একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যেও প্রোটিনের কাঠামোগত পার্থক্য থাকবে।

প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য (Properties of Protein)

১. প্রোটিন উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট কলয়েড ধর্মী বৃহদাকার জৈব যৌগ।
২. এটি পানিতে, লঘু এসিডে, ক্ষার এবং মৃদু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয় (যেমন– স্ক্লেরোপ্রোটিন) কিন্তু অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।
৩. বহুবিধ ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোটিনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে।
৪. প্রোটিনের মূল রাসায়নিক উপাদান হলো কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। এছাড়াও এতে সালফার, আয়রন ও কপার থাকে।
৫. তাপ প্রয়োগে প্রোটিন তঞ্চিত হয় এবং তখন এর কার্যক্ষমতা থাকে না।
৬. এর আণবিক গঠন পরিবর্তিত হয়।
৭. প্রোটিন সাধারণত তড়িৎধর্মী ও বাফার দ্রবণ হিসেবে কাজ করে।
৮. প্রোটিনের মনোমার অ্যামিনো এসিডে ক্ষারীয় গ্রুপ ($-NH_2$) এবং অম্লীয় গ্রুপ (–COOH) থাকে বলে এটি একই সাথে ক্ষারীয় ও অম্লীয় উভয় গুণ প্রকাশ করে। এজন্য প্রোটিনকে **অ্যাম্ফোটেরিক অণু** (amphoteric molecule) বলে।
৯. একে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে (এসিড, ক্ষার ও এনজাইম সহযোগে) অ্যামিনো এসিড পাওয়া যায়।
১০. প্রোটিন দ্রবণে **নিন-হাইড্রিন** প্রয়োগ করে তাপ দিলে **লাল বর্ণ** ধারণ করে।
১১. অধিকাংশ প্রোটিন বৃহদাণু; এদের আণবিক ওজন 5000-5000000 ডাল্টন।
১২. প্রোটিনকে বিভিন্নভাবে অধঃক্ষিপ্ত করা যায়।

প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ (Types of Protein)

Escherichia coli এর একটি কোষে তিন হাজার ধরনের প্রোটিন থাকে। মানুষের দেহে প্রায় এক লক্ষ ধরনের প্রোটিন আছে যা *E.coli* এর প্রোটিন থেকে আলাদা। প্রোটিনের বিশাল রাজ্যে শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিও বিভিন্ন প্রকার।

ক. জৈবিক কার্যাবলির ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ : প্রোটিন দু'ধরনের; যথা–

i. গাঠনিক প্রোটিন (Structural protein) : এরা জীবদেহের বিভিন্ন অংশ গঠন করে। কোষ এবং টিস্যুর গঠনকে সুদৃঢ় করে। এ ধরনের প্রোটিন ত্বক, চুল, শিং, ক্ষুর, অন্তঃকঙ্কাল (অস্থি ও তরুণাস্থি), যোজক টিস্যু ইত্যাদিতে

CamScanner

পাওয়া যায়। উদাহরণ : কেরাটিন (ত্বক, শিং, নখ, ক্ষুর, পালক ইত্যাদি), কোলাজেন (অস্থি, টেনডন, যোজক টিস্যু ইত্যাদি), ফাইব্রাইন (সিল্ক ও মাকড়সার জাল), স্ক্লেরোটিন (পতঙ্গের বহিঃকঙ্কাল), কনড্রিন (তরুণাস্থিতে), সেইন (অস্থিতে)।

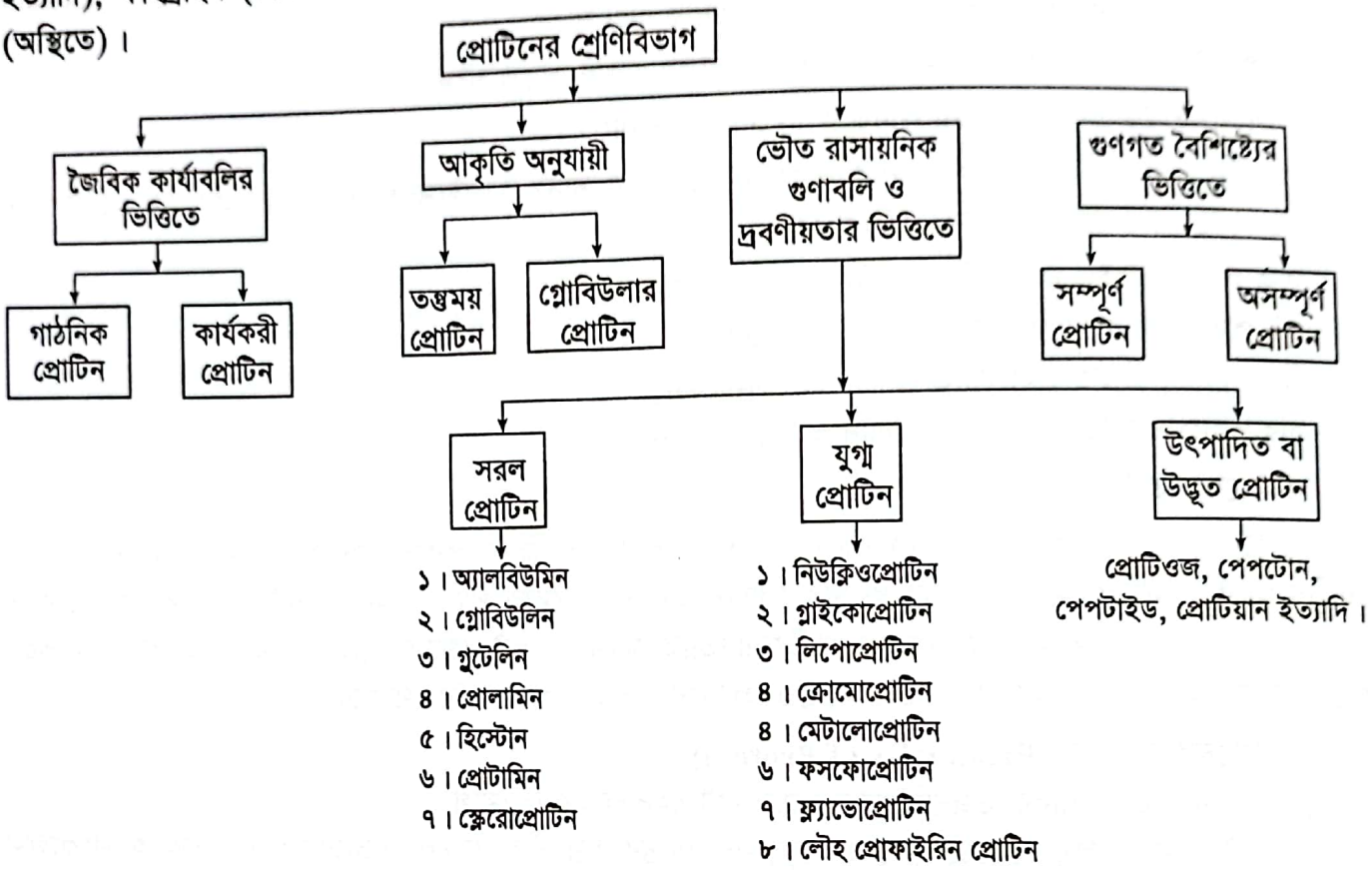

ii. কার্যকরী প্রোটিন (Functional protein) : এরা জীবদেহে বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে অংশগ্রহণ করে। এদেরকে নিয়ন্ত্রক বা রেগুলেটরি প্রোটিনও বলা হয়। যেমন–এনজাইম, হরমোন, ভিটামিন, শ্বাসরঞ্জক ইত্যাদি।

খ. আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ : আকৃতি অনুযায়ী প্রোটিন দু'ধরনের যথা–

i. তন্তুময় প্রোটিন (Fibrous protein) : যখন পলিপেপটাইডগুলো প্রোটিনে সমান্তরালভাবে একটি অক্ষ বরাবর সজ্জিত থাকে তখন তা লম্বা তন্তুর আকার ধারণ করে। এমন আকৃতির প্রোটিনকে তন্তুময় প্রোটিন বলে। যেমন– কেরাটিন, কোলাজেন, ফাইব্রাইন ইত্যাদি।

ii. গ্লোবিউলার প্রোটিন (Globular protein) : যেসব প্রোটিনের গঠন গোলাকৃতির হয় তাদের গ্লোবিউলার প্রোটিন বলে। যেমন– মায়োগ্লোবিন, ইনস্যুলিন, হিমোগ্লোবিন, অ্যালকাইন ফসফাটেজ ইত্যাদি।

গ. গঠন অনুসারে শ্রেণিবিভাগ : গঠন অনুসারে প্রোটিন চার প্রকার ১. প্রাইমারি ২. সেকেন্ডারি ৩. টারশিয়ারি এবং ৪. কুয়াটার্নারি।

ঘ. ভৌত রাসায়নিক গুণাবলি ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে : আধুনিক তথ্য অনুসারে ভৌত রাসায়নিক গুণাবলি ও দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা– ১. সরল প্রোটিন, ২. যুগ্ম প্রোটিন ও ৩. উৎপাদিত বা উদ্ভূত প্রোটিন।

চিত্র ৩.৩ : প্রোটিনের বিভিন্ন গঠন

CamScanner

১. **সরল প্রোটিন (Simple Protein) :** যেসব প্রোটিনকে এনজাইম বা এসিড দিয়ে হাইড্রোলাইসিস করলে শুধু অ্যামিনো এসিড পাওয়া যায়, তাদের **সরল প্রোটিন** বলে। এগুলোই হলো প্রকৃত প্রোটিন। দ্রবণীয়তা (solubility) ভিত্তিতে সরল প্রোটিনকে ৭ ভাগে ভাগ করা হয়, যথা–

i. **অ্যালবিউমিন (Albumins) :** এ জাতীয় প্রোটিন পানি ও লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে সাদা বর্ণের দ্রবণ তৈরি করে। এরা তাপ প্রয়োগে জমাট বাঁধে। ডিমের সাদা অংশে, রক্তরসে, দুধে, পাতা ও বীজে এ প্রোটিন থাকে। উদাহরণ– ডিমের সাদা অংশে **অ্যালবিউমিন**, যব ও বার্লির β **অ্যামাইলেজ**, রক্তরস ও লসিকায় **ল্যাক্টোগ্লোবিন সিরাম অ্যালবিউমিন**, দুধের **ল্যাক্টো অ্যালবিউমিন**, শিম ও অন্যান্য লিগিউমের বীজের **লিগুমিন** (legumin), গম বীজের ও শৈবালের **লিউকোসিন**, মাংশপেশির **মায়ো-অ্যালবিউমিন** ইত্যাদি।

ii. **গ্লোবিউলিন (Globulins) :** এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে প্রায় অদ্রবণীয়, তবে লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয়। এরা তাপে জমাট বাঁধে। উদ্ভিদের বীজে এ ধরনের প্রোটিন অধিক থাকে। উদাহরণ– দুধের **ল্যাক্টোগ্লাবিন**, রক্তরসের **সিরাম গ্লোবিউলিন** ও **আলফাগ্লোবিন**, ডিমের কুসুমের **ফসভাইটিন** ও **অভোগ্লোবিউলিন**, চোখের লেন্সে **ক্রিস্টালাইন গ্লোবিউলিন**, মাংশপেশির **মায়োসিন গ্লোবিউলিন** ইত্যাদি হচ্ছে প্রাণিজ গ্লোবিউলিন। শন, পাট, তুলা ইত্যাদি আঁশের **এডেস্টিন**, মটরবীজের **লেগুলিন**, আলুর **টিউবেরিন**, সয়াবিনের **গ্লাইসিনিন**, চিনাবাদামের এরাচিন, কমলালেবুর **পোমেলিন** ইত্যাদি হচ্ছে উদ্ভিজ্জ গ্লোবিউলিন।

iii. **গ্লুটেলিন (Glutelins) :** এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে অদ্রবণীয়, তবে লঘু এসিড বা লঘু ক্ষার দ্রবণে দ্রবণীয়। এরা তাপে জমাট বাঁধে না। প্রাণিদেহে এটি পাওয়া যায় না। শস্য দানায় এরা অধিক পরিমাণে থাকে। উদাহরণ- গমের ও ভুট্টার **গ্লুটেলিন**, ধানের **অরাইজেনিন** ইত্যাদি।

iv. **প্রোলামিন (Prolamins) :** এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে ও অ্যাবস্যলুট ইথানলে (100%) অদ্রবণীয়, তবে অ্যালকোহলে (70 – 80%) দ্রবণীয়। তাপে জমাট বাঁধে না। এরা শুধু বীজে থাকে। হাইড্রোলাইসিসে এরা **প্রোলিন** ও **অ্যামোনিয়া** উৎপন্ন করে। উদাহরণ–গম ও রাইয়ের **গ্লিয়াডিন**, ভুট্টার **জেইন**, বার্লির **হর্ডিন** ইত্যাদি।

v. **হিস্টোন (Histones) :** এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে অথবা পাতলা ক্ষার বা এসিড দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। এরা তাপে জমাট বাঁধে না। এদের ক্ষারীয় অ্যামিনো এসিড (যেমন– অরিজিনিন লাইসিন) বেশি থাকে, তাই এরা ক্ষারীয় প্রকৃতির হয়। উদাহরণ– ক্রোমোজোমে অবস্থিত **হিস্টোন** (H_1, H_2, H_3, H_4 ইত্যাদি) নিউক্লিয়াসের **নিউক্লিওহিস্টোন** ইত্যাদি।

vi. **প্রোটামিন (Protamins) :** এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে দ্রবণীয়, ক্ষারধর্মী এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন। এরা তাপে জমাট বাঁধে না। এগুলো নিউক্লিয়াসে নিউক্লিক এসিডের সাথে বেশি দেখা যায়। প্রোটামিনে টাইরোসিন, ট্রিপটোফ্যান এবং সালফারযুক্ত অ্যামিনো এসিড থাকে না। উদাহরণ– **ক্লুপিন** ও **স্যামিন** বা **স্যালমিন** (স্যামন মাছের শুক্রাণুতে থাকে) ইত্যাদি।

vii. **স্কেরোপ্রোটিন (Seleroproteins) :** এ জাতীয় প্রোটিন পানি ও মৃদু লবণ দ্রবণে অদ্রবণীয়। এটি একটি প্রাণিজ প্রোটিন। এ প্রকার প্রোটিন ত্বক, শিং, চুল, নখ, ক্ষুর, অন্তঃকঙ্কাল (হাড়) ও যোজক টিস্যুতে বেশি থাকে। উদাহরণ– **কেরাটিন** (শিং, চুল, নখ, ক্ষুর), **কোলাজেন** (ত্বক, হাড়ে যুক্ত টেনডন), **ইলাস্টিন** (লিগামেন্টে) ইত্যাদি।

২. **যুগ্ম বা সংশ্লেষিত প্রোটিন (Conjugated Proteins) :** যে প্রোটিনের সাথে কোনো অপ্রোটিন অংশ (প্রোসথেটিক গ্রুপ = prosthetic group) যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় **কনজুগেটেড প্রোটিন** বা **যুগ্ম প্রোটিন**। কনজুগেটেড প্রোটিনকে সাধারণত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়; যথা:

i. **নিউক্লিওপ্রোটিন (Nucleoproteins) :** যে প্রোটিন হাইড্রোলাইসিস করলে যে প্রোটিন থেকে একটি সরল প্রোটিন ও একটি নিউক্লিক এসিড পাওয়া যায় তা হলো **নিউক্লিওপ্রোটিন**। এরা পানিতে দ্রবণীয়। এদেরকে ক্রোমোজোমে পাওয়া যায়।

CamScanner

ii. **গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন (Glycoproteins or Mucoproteins) :** প্রোটিনের সাথে বিভিন্ন ধরনের কার্বোহাইড্রেট (বিশেষ করে মনোস্যাকারাইড) যুক্ত হলে তাকে **গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন** বলে। প্লাজমামেমব্রেন, জেলিফিশ, লালা ও কিছু ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরে এ প্রোটিন পাওয়া যায়।

iii. **লিপোপ্রোটিন (Lipoproteins) :** সরল প্রোটিনের সাথে লিপিড যুক্ত থাকলে তাকে **লিপোপ্রোটিন** বলে। এর লিপিড অংশ গঠিত হয় **কোলেস্টেরল ও ফসফোলিপিড** দিয়ে। এটি পানিতে দ্রবণীয়। কোষের প্লাজমামেমব্রেন ও বিভিন্ন অঙ্গাণুর মেমব্রেন (মাইটোকন্ড্রিয়া, নিউক্লিয়াস, ক্লোরোপ্লাস্ট ল্যামিলী) ETC প্রধানত লিপোপ্রোটিনে তৈরি। রক্তরসে বিভিন্ন লিপোপ্রোটিন থাকে। উদাহরণ– LDL, HDL, কাইলোমাইক্রন ইত্যাদি।

iv. **ক্রোমোপ্রোটিন (Chromoproteins) :** যেসব যুগ্ম প্রোটিনের অপ্রোটিন অংশটি রঞ্জক উপাদানে গঠিত তাদের **ক্রোমোপ্রোটিন** বলে। উদাহরণ– হিমোগ্লোবিন প্রোটিন, বিলিপ্রোটিন, ক্যারোটিনয়েড প্রোটিন, মায়োগ্লোবিন, ফ্লাভোপ্রোটিন, ক্লোরোফিল প্রোটিন ইত্যাদি।

v. **মেটালোপ্রোটিন (Metaloproteins) :** অনেক এনজাইমে অ্যাক্টিভেটর হিসেবে কোনো ধাতু বা মেটাল (Fe, Mn, Mg, Zn) থাকে। ধাতু বা মেটাল সম্বলিত এনজাইমগুলো হলো **মেটালোপ্রোটিন**। উদাহরণ– সিডারোফিলিন, সেলোপ্লাজমিন, সাইটোক্রোম, অক্সিডেজ, ফেরিটিন, নাইট্রোজিনেজ, হিমোগ্লোবিন ইত্যাদি।

vi. **ফসফোপ্রোটিন (Phosphoproteins) :** যে সকল প্রোটিনের সাথে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোরিক এসিড যুক্ত থাকে তাকে **ফসফোপ্রোটিন** বলে। দুধের কেসিনোজেন, ডিমের ভাইটেলিন এ জাতীয় প্রোটিন।

vii. **ফ্ল্যাভোপ্রোটিন (Flavoproteins) :** যুগ্ম প্রোটিনের প্রোটিন অণুর সঙ্গে ফ্ল্যাভিন গ্রুপ, যেমন– FAD (Flavin Adenine Dinucleotide) যুক্ত থাকলে তাকে **ফ্ল্যাভোপ্রোটিন** বলে। এদের জলীয় দ্রবণে হলুদ। উদাহরণ– সাক্সিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ, NADH-ডিহাইড্রোজিনেজ, সালফাইড রিডাক্টেজ ইত্যাদি।

৩. **উদ্ভূত বা উৎপাদিত প্রোটিন (Derived Proteins) :** এসব প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকে না। তাপের প্রভাবে এনজাইমের বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন অণু থেকে তৈরি হয়। উদাহরণ– প্রোটিওজ, পেপটাইড, পলিপেপটাইড, পেপটোন, ফাইব্রিন, প্রোটিয়ান, মেটাপ্রোটিন ইত্যাদি। এছাড়াও উৎপাদিত প্রোটিনের মধ্যে রয়েছে মায়োসিন থেকে **মায়োসান** এবং অ্যালবুমিন থেকে **অ্যালবুসোম** ইত্যাদি।

ঘ. গুণগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে : প্রোটিন দু'প্রকার, যথা :

১. **প্রথম শ্রেণির প্রোটিন বা সম্পূর্ণ প্রোটিন :** যেসব প্রোটিনে সবক'টি অপরিহার্য অ্যামিনো এসিড থাকে তাদের **প্রথম শ্রেণির প্রোটিন বা সম্পূর্ণ প্রোটিন** বলে। যেমন– দুধ, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি। সাধারণত সব প্রাণিজ প্রোটিনই প্রথম শ্রেণির প্রোটিন। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মধ্যে সয়াবিন, বাদাম, গম ও ভুট্টার **গ্লুটেলিন** ইত্যাদি প্রথম শ্রেণির প্রোটিনের অন্তর্গত।

২. **দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন বা অসম্পূর্ণ প্রোটিন :** যেসব প্রোটিনে সবক'টি অপরিহার্য অ্যামিনো এসিড থাকে না তাদের **দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন বা অসম্পূর্ণ প্রোটিন** বলে। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব উদ্ভিজ্জ প্রোটিনই দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন। প্রাণিজ প্রোটিনের মধ্যে জিলেটিন দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন।

প্রোটিনের রাসায়নিক উপাদান : বিশ প্রকার অ্যামিনো এসিডই প্রোটিনের মূল রাসায়নিক উপাদান। এছাড়া যুগ্ম প্রোটিনের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, নিউক্লিক এসিড ইত্যাদি থাকে।

ডিম ও দুধ আদর্শ প্রোটিন। মাছ-মাংস প্রকৃত আদর্শ প্রোটিন নয়। ডালের প্রোটিন আরও নিম্নমানের।

প্রোটিনের কাজ

১. জীবদেহের **গাঠনিক উপাদান** হিসেবে কাজ করে, যেমন– কোলাজেন।

২. কোষে প্রোটিন সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কাজ করে এবং প্রয়োজনে **শক্তি উৎপাদন** করে।

CamScanner

৩. বিভিন্ন অঙ্গাণু এবং কোষঝিল্লি গঠনে কাজ করে।
৪. এনজাইম হিসেবে জীবদেহের ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তথা জীবদেহকে সচল রাখে, যেমন– রুবিস্কো।
৫. অ্যান্টিবডির গাঠনিক উপাদান হিসেবে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে এবং দেহকে রোগমুক্ত রাখে, যেমন– ইমিউনোগ্লোবিউলিন।
৬. জীবদেহের প্রয়োজনীয় হরমোন উৎপন্ন করে, যেমন– ইনসুলিন।
৭. হিস্টোন প্রোটিন নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিক এসিডকে কার্যকর করে।
৮. কিছু প্রোটিন বিষাক্ত হওয়ায় অনেক জীব তা খেয়ে মারা যায় (সাপের বিষের প্রোটিন)।
৯. যে সকল উদ্ভিদে বিষাক্ত প্রোটিন থাকে তারা অনেক পশু পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।
১০. হিমোগ্লোবিন প্রোটিন প্রাণিদেহের সমস্ত কোষে O_2 সঞ্চালন করে।
১১.মানবদেহের পেপটাইড থেকে উৎপাদিত প্রোটিন ডিফেনসিভ (defensive) অ্যান্টিবডি হিসেবে কাজ করে।
১২. পিগমেন্ট হিসেবে কাজ করে, যেমন– রোডোপসিন।
১৩. ইন্টারফেরন (interferon) একটি কোষীয় প্রোটিন। এটি ভাইরাস আক্রমণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেহে তৈরি হয়। ধারণা করা হচ্ছে ইন্টারফেরন ক্যান্সার ও ভাইরাসজনিত রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা যাবে।
১৪. এক গ্রাম প্রোটিন জারণে ৪.১ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।
১৫. বীজে অবস্থিত কিছু প্রোটিন বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় খাদ্য সরবরাহ করে।
১৬. আয়নের বাহক হিসেবে প্রোটিন ভূমিকা রাখে।
১৭. রক্তের প্লাজমাপ্রোটিন, রক্তের হোমিওস্টেসিস ও কোলয়ডাল অভিস্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।
১৮. ক্রোমোজোমের স্থায়িত্ব রক্ষায় এবং জিন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণে হিস্টোন প্রোটিন বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকা (Role of Protein in Living Body)

জীবদেহ গঠনের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। জীবদেহে প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. এনজাইমের ভূমিকা : জীবদেহের অভ্যন্তরে সংঘটিত সকল বিক্রিয়া সুনির্দিষ্ট এনজাইম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সকল এনজাইম প্রোটিন। এনজাইম জৈব অনুঘটক হিসেবে প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করে যা জীবের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২. ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিতে : দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধির জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। বিভিন্ন জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ, যেমন– শ্বসন, রেচন, জনন প্রভৃতি সম্পন্ন করার জন্য দেহের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা পূরণ করার জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন হয়।

৩. গাঠনিক ভূমিকা : তন্তুজ প্রোটিন বিভিন্ন অঙ্গের আবরণী তৈরি, বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করে। কোলাজেন নামক প্রোটিন টেনডনের মূল উপাদান যা অস্থির সাথে পেশির সংযোগ স্থাপন করে।

৪. পরিবহনে : কোষ অভ্যন্তরে বিভিন্ন অণুর পরিবহন, আয়ন স্থানান্তর প্রভৃতি প্রোটিনের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এছাড়া হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিন প্রাণিদেহের সকল কোষ O_2 সরবরাহ করে।

৫. জীবদেহ গঠনে : জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশ হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হরমোন বিশেষ ধরনের প্রোটিন দ্বারা গঠিত। বিশেষ কয়েকটি হরমোন; যেমন– ইনসুলিন, সোমাটোট্রফিক হরমোন (STH), লিউটিট্রফিন হরমোন (LTH) ইত্যাদি।

৬. বিষক্রিয়া ও আত্মরক্ষা : বিভিন্ন জীবে বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় প্রোটিন থেকে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। এসব পদার্থ জীবের আত্মরক্ষার জন্য সহায়ক। যেমন– সাপের বিষ বা ভেনম যা সাপের আত্মরক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

৭. ভাইরাস ও ক্যান্সার প্রতিরোধে : ইন্টারফেরন নামক বিশেষ প্রোটিন ভাইরাস প্রতিরোধক হিসেবে ব্লাড ক্যান্সার নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

CamScanner

৮. **অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন :** অ্যান্টিবায়োটিক নানা ধরনের রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বিপাকীয় বিক্রিয়া জীবদেহে, বিশেষ করে অণুজীবে এসব অ্যান্টিবায়োটিক উৎপন্ন হয়।

৯. **ইমিউনিটি :** রোগ জীবাণু ধ্বংস ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পোষক দেহে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তাও প্রোটিন।

১০. **ব্যথানাশক হিসেবে :** মস্তিষ্কে উৎপন্ন এন্ডোরফিন ব্যথানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১১. **ঘুম সৃষ্টিতে :** অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত ঘুম আনয়নকারী **s-factor** বিশেষ ধরনের প্রোটিন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১২. **জৈবিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ :** হরমোন জীবদেহে রাসায়নিক দূত হিসেবে কাজ করে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

১৩. **রক্ত তঞ্চনে :** রক্তের প্লাজমাপ্রোটিন (যেমন– প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন ইত্যাদি) বাতাসের সংস্পর্শে রক্ত তঞ্চনে সহায়তা করে।

১৪. **কোষের তারল্যতা রক্ষা :** কোষস্থ প্রোটিন কোষীয় তারল্যতা রক্ষা করে শুষ্কতা থেকে কোষকে রক্ষা করে।

১৫. **ইউরিয়া ও মেলানিন সংশ্লেষ :** প্রোটিনের গাঠনিক উপাদান অ্যামিনো এসিড (যেমন– আর্জিনিন ও টাইরোসিন) থেকে যকৃতে ইউরিয়া ও মেলানিন সংশ্লেষিত হয়।

১৬. **অন্যান্য :** কোষচক্র, ট্রান্সক্রিপশন ইত্যাদি সম্পন্ন করতেও প্রোটিনের প্রয়োজন।

খাদ্য তালিকায় প্রোটিন

আমাদের খাদ্য তালিকায় প্রোটিন জাতীয় খাবার রাখা অপরিহার্য, কারণ শরীর গঠনে প্রোটিনের ভূমিকাই মুখ্য। প্রোটিন তৈরি হয় বিশ প্রকার অ্যামিনো এসিড দিয়ে। গাঠনিক ইউনিট হিসেবে এই বিশ প্রকার অ্যামিনো এসিডই অত্যাবশ্যকীয়। মানবদেহের চাহিদা অনুসারে মাত্র ৮টি অ্যামিনো এসিড (লিউসিন, আইসোলিউসিন, লাইসিন, মেথিওনিন, থ্রিওনিন, ভ্যালিন, ফিনাইল অ্যালানিন এবং ট্রিপ্টোফ্যান) কে অত্যাবশ্যকীয় (essential) অ্যামিনো এসিড বলা হয়। এর কারণ হলো অন্য ১২টি অ্যামিনো এসিড আমাদের দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হতে পারে কিন্তু উক্ত ৮টি অ্যামিনো এসিড দেহাভ্যন্তরে সংশ্লেষিত হয় না, খাদ্যের মাধ্যমে দেহে গ্রহণ করা হয়।

সব প্রোটিনে সব অ্যামিনো এসিড থাকে না; কিন্তু খাবারে একই সাথে সবক'টি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড থাকতে হবে। তাই যেসব প্রোটিনে সবক'টি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড থাকে খাদ্য তালিকায় সেগুলোই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

অতএব, খাদ্যের জন্য মাত্র এক ধরনের উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল হলে প্রোটিন স্বল্পতা দেখা দিবে। এ সমস্যা সমাধানে দু'ধরনের উদ্ভিদজাত প্রোটিন একসঙ্গে খেতে হবে। যেমন– গমের আটার (এতে কেবল লাইসিন থাকে না) সাথে মটরবীজ (এটি লাইসিনের ভালো উৎস) মিশিয়ে একটি সুষম প্রোটিন খাবার তৈরি করা যায়। এভাবে দুটি উদ্ভিদ পরস্পরের অ্যামিনো এসিড পরিপূরক হয়ে খাদ্যে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিডের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে।

মান বিচারে প্রাণিজ প্রোটিনই (মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি) অগ্রগামী (উৎকৃষ্ট) এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিন (যেমন– ডাল) অনুগামী। প্রকৃতপক্ষে প্রোটিনের মান বিচারে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিডসমূহের উপস্থিতিই প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। অত্যাবশ্যকীয় ৮টি অ্যামিনো এসিডের একটিও যদি ন্যূনতম আদর্শ পরিমাণের চেয়ে কম থাকে তাহলেই এর মান কমে যায়। কারণ দেহ সঠিক পরিমাণে তা শোষণ করতে পারে না। মানের দিকে থেকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পেছনে থাকার এটিই কারণ। আদর্শ প্রোটিন পাওয়া যায় ডিম এবং দুধে। তাই এ দুটি আদর্শ খাবার। চালের প্রোটিন এবং ডালের প্রোটিন একসঙ্গে হলে একটির অভাব অপরটি কিছুটা পূরণ করে, তাই ডাল-ডালের খিচুড়ির পুষ্টিমান ভাত এবং ডালের চেয়ে উপরে।

CamScanner

আদর্শ প্রোটিন : প্রতি ১০০ গ্রাম আদর্শ প্রোটিনে অ্যামিনো এসিডের পরিমাণ (গ্রাম)

	আইসোলিউসিন	লিউসিন	লাইসিন	ফিনাইল অ্যালানিন	মেথিওনিন	থ্রিওনিন	ট্রিপ্টোফ্যান	ভ্যালিন
আদর্শ প্রোটিন	৪.৩	৪.৯	৪.৩	২.৯	২.৩	২.৯	১.৪	৪.৩
ডিম	৬.৮	৯.০	৬.৩	৬.০	৩.১	৫.০	১.৭	৭.৪
গরুর দুধ	৬.৪	৯.৯	৭.৮	৪.৯	২.৪	৪.৬	১.৪	৬.৯
মসুর ডাল	৫.২	৬.৯	৬.১	৪.১	০.৬	২.৬	০.৮	৫.৫
মাছ	৬.৫	৯.৫	৯.০	৪.৪	৩.২	৪.৭	১.২	৬.০
মাংস	৫.২	৭.৮	৮.৬	৩.৯	২.৭	৪.৪	১.০	৫.১

বি.দ্র: ডিম এবং দুধ আদর্শ প্রোটিন। মাছ-মাংসে ট্রিপ্টোফ্যান আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম। ডালে মেথিওনিন ও ট্রিপ্টোফ্যান আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম। কাজেই মাছ-মাংস প্রকৃত আদর্শ প্রোটিন নয়। ডালের প্রোটিন আরো নিম্নমানের।

প্রাণিজ প্রোটিন যেমন– মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিডে সমৃদ্ধ হওয়ায় সারাবিশ্বে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এশিয়ান ও আফ্রিকানদের চেয়ে উত্তর আমেরিকা অনেক বেশি পরিমাণ প্রাণিজ প্রোটিন আহার করে থাকে। উন্নত দেশগুলোতে ক্যালরির ৪০%, আর উন্নয়নশীল দেশে ক্যালরির ২৩% আসে প্রাণিজ খাদ্য থেকে। সারাবিশ্বে উৎপাদিত গবাদি পশুর মাংসের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভোগ করে উত্তর আমেরিকা।

প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা

মানবদেহের পেশি, অস্থি ও অন্যান্য গঠন এবং বিভিন্ন ধরনের জৈবরাসায়নিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রতিদিন প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। একজন সুস্থ মানুষের বয়সভিত্তিক বিভিন্ন মাত্রায় প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। নিচে মানুষের দৈনিক প্রোটিনের চাহিদার একটি তালিকা দেওয়া হলো :

৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর	১০ গ্রাম
৬ – ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর	১৯ – ৩৪ গ্রাম
১৩ – ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোরের	৫২ গ্রাম
১৩ – ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোরীর	৪৬ গ্রাম
পরিণত পুরুষের	৫৬ গ্রাম
পরিণত মহিলার	৪৬ গ্রাম
গর্ভবতী মা কিংবা প্রসূতি মহিলার	৭১ গ্রাম

লিপিড (Lipid) বা স্নেহ পদার্থ

কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সহযোগে গঠিত ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট এস্টারকে ফ্যাট বা লিপিড বলে। জার্মান বিজ্ঞানী Bloor ১৯৪৩ সালে সর্বপ্রথম Lipid শব্দটি ব্যবহার করেন। এগুলো সাধারণভাবে স্নেহ পদার্থ নামে পরিচিত। গ্রিক শব্দ *'lipos'*- এর অর্থ হলো ফ্যাট।

রাসায়নিকভাবে অ্যালকোহল ও ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টারকে লিপিড বলে। লিপিড প্রধানত চর্বি ও তেলরূপে বিদ্যমান থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় কতিপয় লিপিড শক্ত থাকে এবং ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কতিপয় লিপিড তরল থাকে। শক্ত ও কঠিন লিপিডকে চর্বি (fat) বা স্নেহ এবং তরল লিপিডকে তেল (oil) বলা হয়। লিপিডের নির্দিষ্ট কোনো গলনাঙ্ক নেই।

লিপিডের উৎস : উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উৎস থেকেই লিপিড পাওয়া যায়। প্রাণিজ চর্বি, ঘি, মাখন, বাটার, ডিম ইত্যাদি হচ্ছে লিপিডের প্রাণিজ উৎস। কিছু উদ্ভিদের বীজ যেমন– বাদাম, সয়াবিন, নারিকেল, সরিষা , তিল, তিসি, রেড়ি, পাম, জলপাই ইত্যাদি হচ্ছে উদ্ভিজ্জ লিপিডের উৎস। উদ্ভিদের ফল ও বীজে অধিক পরিমাণ লিপিড এবং পাতা, মূল ও কাণ্ডে অল্প পরিমাণ লিপিড সঞ্চিত থাকে।

CamScanner

লিপিড-এর বৈশিষ্ট্য (Properties of Lipid)

১. লিপিড বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন।
২. এটি পানিতে অদ্রবণীয়।
৩. লিপিড পানি অপেক্ষা হালকা, তাই পানিতে ভাসে।
৪. এরা ফ্যাটি এসিডের অ্যাস্টার হিসেবে (actual or potential) বিরাজ করে।
৫. আর্দ্রবিশ্লেষিত হলে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল উৎপন্ন করে।
৬. আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। এদের সুনির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নেই।
৭. সাধারণ উষ্ণতায় (20° সে.) কিছু লিপিড (যেমন- তেল) তরল এবং কিছু লিপিড (যেমন- চর্বি) কঠিন অবস্থায় থাকে।
৮. এরা হাইড্রোফোবিক অর্থাৎ পানি বিকর্ষী এবং কিছু লিপিড অ্যাম্ফিফিলিক ধরনের।
৯. এরা পানিতে সমসত্ত্বভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
১০. ক্ষারের উপস্থিতিতে লিপিডের আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটলে সাবান উৎপন্ন হয়।
১১. লিপিডের সাথে Sudan III দ্রবণ যোগ করলে লাল বর্ণ ধারণ করে।
১২. এদের সুনির্দিষ্ট কোনো গলনাঙ্ক নেই।
১৩. ক্লোরোফর্ম, ইথার, বেনজিন, অ্যালকোহল ইত্যাদি জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়।

লিপিড-এর গঠন

সাধারণভাবে গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডের সমন্বয়ে লিপিড গঠিত হয়। **ফসফোলিপিড**-এ গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিড ছাড়া ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন বেস থাকে। **গ্লাইকোলিপিড**-এ ফ্যাটি এসিড, শ্যুগার (হেক্সোজ) ও নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ থাকে। **মোমজাতীয় লিপিড**-এ গ্লিসারল-এর পরিবর্তে অ্যালকোহল বা কোলেস্টেরল থাকে।

লিপিড-এর কাজ

১. চর্বি ও তেল জাতীয় লিপিড উদ্ভিদদেহে **সঞ্চিত খাদ্য** হিসেবে জমা থাকে। বিভিন্ন তেলবীজের (সরিষা, তিল, সয়াবিন ইত্যাদি) অঙ্কুরোদগমকালে লিপিড খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। এদের বিজারণকালে অধিক ATP তৈরি হয়।
২. ফসফোলিপিড বিভিন্ন **মেমব্রেন গঠনে** উপাদান হিসেবে কাজ করে।
৩. মোমজাতীয় লিপিড পাতার বহিরাবরণে স্তর (কিউটিকল) সৃষ্টি করে **অতিরিক্ত প্রস্বেদন রোধ** করে।
৪. কতিপয় এনজাইমের **প্রোসথেটিক গ্রুপ** হিসেবে ফসফোলিপিড কাজ করে। এছাড়া ফসফোলিপিড আয়নের বাহক হিসেবেও কাজ করে।
৫. সালোকসংশ্লেষণে **গ্লাইকোলিপিড** বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৬. প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে **লিপোপ্রোটিন** গঠন করে। লিপোপ্রোটিন শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে।
৭. **মানুষ খাদ্য হিসেবে** (যেমন- প্রাণিজ চর্বি, ভোজ্য তেল, ঘি ইত্যাদি) গ্রহণ করে।
৮. **প্রসাধন শিল্পেও** স্নেহদ্রব্য ব্যবহৃত হয়।
৯. **আচার** তৈরিতে তেলের ব্যবহার সুপ্রাচীন।

লিপিডের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Lipid)

ক. আণবিক গঠন অনুযায়ী : লিপিড প্রধানত ৫ প্রকার, যথা- ১. নিউট্রাল লিপিড, ২. ফসফোলিপিড, ৩. গ্লাইকোলিপিড, ৪. টারপিনয়েডস এবং ৫. মোম।

খ. রাসায়নিক গঠন প্রকৃতি অনুসারে : Bloor (1943) লিপিডকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করেন, যা এখনও সর্বজন সমাদৃত। যথা- ১. সরল লিপিড, ২. যৌগিক লিপিড ও ৩. উদ্ভূত বা উপজাত লিপিড।

CamScanner

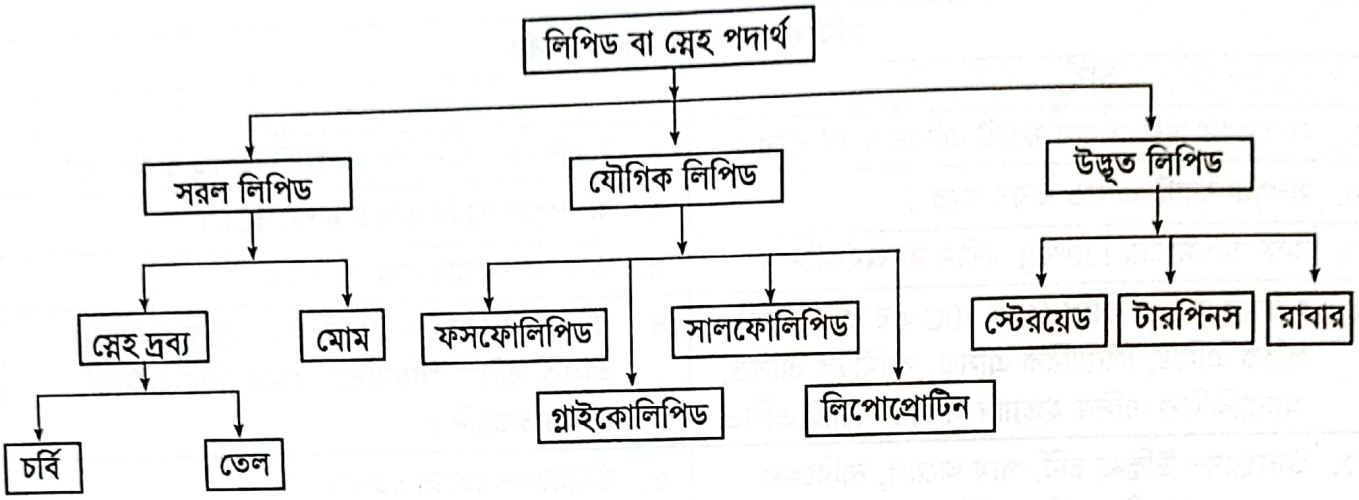

নিচে লিপিডের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো–

১. সরল লিপিড (Simple Lipids) :

যেসব লিপিডের বিশ্লেষণে স্নেহ পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না তাকে সরল লিপিড বলে। সরল লিপিড দু'প্রকার : i. স্নেহদ্রব্য (চর্বি ও তেল) ও ii. মোম।

i. স্নেহদ্রব্য (চর্বি ও তেল) : এক অণু গ্লিসারোল ও ফ্যাটি এসিডের এস্টারকে বলা হয় স্নেহদ্রব্য বা ট্রাইগ্লি ারাইড। ট্রাইগ্লিসারাইড এক অণু গ্লিসারোল ও তিন অণু ফ্যাটি এসিড নিয়ে গঠিত।

এদেরকে নিউট্রাল লিপিডও বলা হয়। তবে মানুষের রক্তে অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইড অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস (atherosclerosis) সৃষ্টি করে যা হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

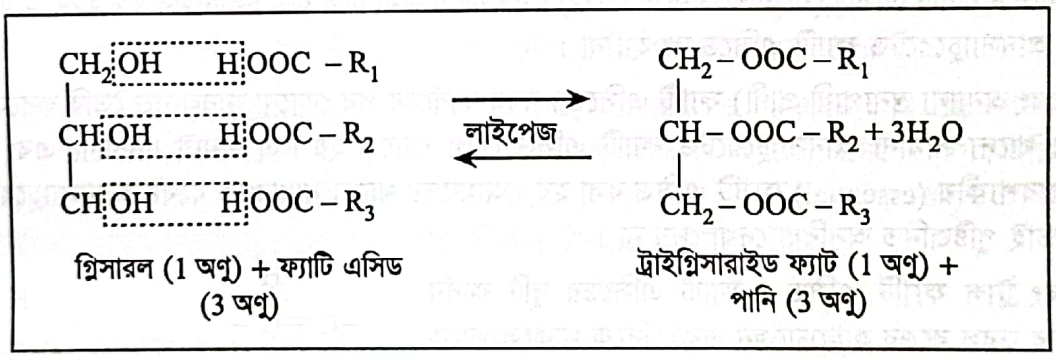

ট্রাইগ্লিসারাইডকে দু'ধরনের, যথা– i. চর্বি ii. তেল

i. চর্বি (Fats) : যেসব ট্রাইগ্লিসারাইড সম্পৃক্ত (saturated) ফ্যাটি এসিড দিয়ে তৈরি এবং সাধারণ তাপমাত্রায় (20°C) কঠিন অবস্থায় থাকে, তাদের চর্বি বলে। উদাহরণ– উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ চর্বি, মাছের তেল, ঘি, নারিকেল তেল, পাম অয়েল, অলিভ অয়েল প্রভৃতি।

ii. তেল (Oil) : যেসব ট্রাইগ্লিসারাইড অসম্পৃক্ত (unsaturated) ফ্যাটি এসিড তৈরি করে এবং সাধারণ তাপমাত্রায় (20°C) তরল অবস্থায় থাকে, তাদের তেল বলে। উদাহরণ– সকল ভোজ্য উদ্ভিজ্জ তেল (সয়াবিন, সরিষা তেল ইত্যাদি)।

চর্বি ও তেলের কাজ : ১. ফল ও বীজে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। ২. বীজের অঙ্কুরোদগমকালে এসব লিপিড কার্বোহাইড্রেট-এ পরিবর্তিত হয়ে বর্ধিষ্ণু চারার খাদ্য ও শক্তি যোগায়।

CamScanner

চর্বি ও তেল এর মধ্যে পার্থক্য	
চর্বি	তেল
১. সাধারণত লম্বা শিকল ফ্যাটি এসিড ধারণ করে।	১. সাধারণত খাটো শিকল ফ্যাটি এসিড ধারণ করে।
২. সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ধারণ করে।	২. অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ধারণ করে।
৩. কক্ষ তাপমাত্রায় (20°C) কঠিন বা অর্ধকঠিন।	৩. কক্ষ তাপমাত্রায় (20°C) তরল।
৪. গলনাঙ্ক অনেক বেশি (প্রায় 70C এর কাছাকাছি)। লরিক এসিড, স্টিয়ারিক এসিড, পামিটিক এসিড, অ্যারাকিডিক এসিড ইত্যাদি সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড।	৪. গলনাঙ্ক অনেক কম (মাত্র 5°C এর কাছাকাছি)। অলিক এসিড, লিনোলিক এসিড, লিনেলেনিক এসিড ইত্যাদি।
৫. উদাহরণ– উদ্ভিজ্জ চর্বি, পাম অয়েল, নারিকেল তেল, মাখন, ঘি, প্রাণিজ চর্বি, মাছের তেল।	৫. উদাহরণ– ভোজ্য তেল।

ক. ট্রাইগ্লিসারাইড (Triglyceride)

এক অণু গ্লিসারল এর সাথে তিন অণু ফ্যাটি এসিড সংযুক্ত হয়ে তৈরি হয় এক অণু ট্রাইগ্লিসারাইড। এ সময় তিন অণু পানি তৈরি হয়, কাজেই এটি হলো একটি ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়া। গ্লিসারল হলো একটি ক্ষুদ্র অণুর অ্যালকোহল যেখানে ৩টি কার্বন ও ৩টি হাইড্রোক্সি পার্শ্বগ্রুপ থাকে। ফ্যাটি এসিড হলো একটি হাইড্রোকার্বন চেইন যার এক মাথায় একটি **কার্বোক্সিল গ্রুপ** থাকে। কার্বোক্সিল গ্রুপের ডিহাইড্রেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে OH সাইড গ্রুপের সংযোগকে বলা হয় **এস্টার লিংকেজ** (ester linkage)। ফ্যাটি এসিড চেইন-এ কোনো ডাবল বন্ড না থাকলে তাকে বলা হয় **স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড**, যেমন– স্টিয়ারিক এসিড। ফ্যাটি এসিডের হাইড্রোকার্বন চেইন-এর এক বা একাধিক ডাবল বন্ড থাকলে তাকে বলা হয় **আনস্যারচুরেটেড ফ্যাটি এসিড**, যেমন– লিনোলিক (Linoleic) এসিড, লিনোলেনিক (Linolenic) এসিড। স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড (যা প্রাণী চর্বিতে থাকে) ধমনিগাত্রে জমা হয়ে রক্ত চলাচলের পথ সরু করে দেয়, তাই হৃদরোগ হয়। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিডে তা হয় না।

মানুষ (এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী) ফ্যাটি এসিডের নবম কার্বনের পর কোনো ডাবল বন্ড তৈরি করতে পারে না, তাই আমাদের খাদ্যে সামান্য আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড যোগ করতে হয়। এ জন্যই linoleic এবং linolenic এসিডদ্বয়কে **আবশ্যকীয়** (essential) **ফ্যাটি এসিড** বলা হয়। আমাদের খাদ্যে সাধারণত যথেষ্ট অ্যানস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড থাকে, তাই পুষ্টিজনিত অসুবিধা দেখা দেয় না।

সিজ এবং ট্রান্স ফ্যাটি এসিড : ফ্যাটি এসিডের দুটি কার্বন এটমের মধ্যকার ডবল বন্ডের হাইড্রোজেন একই দিকে থাকলে তাকে বলা হয় Cis-fatty acid; আর ডবল বন্ডের দুটি হাইড্রোজেন একটি অপরটির উল্টো দিকে থাকলে তা হলো trans-fatty acid।

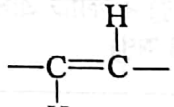

ট্রান্স-ফ্যাটি এসিড

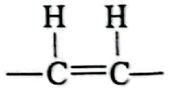

সিজ-ফ্যাটি এসিড

ফ্যাটি এসিডের শেষ CH_3 এর পর ৩নং কার্বনে ডবল বন্ড থাকলে তা হলো ওমেগা-3 এবং ৬নং কার্বনে ডবল বন্ড থাকলে তা হলো ওমেগা–6। ওমেগা –3 এবং ওমেগা –6 অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটিএসিড, দেহে তৈরি হয় না, খাদ্যের সাথে গ্রহণ করতে হয়। ব্রেইন ও চোখের গঠনে এগুলো অধিক প্রয়োজন হয়। সিজ-ফ্যাটি এসিড, যেমন– অলিভ অয়েল, দেহের জন্য উপকারী এবং ট্রান্স-ফ্যাটি এসিড দেহের জন্য অপকারী।

খ. মোম (Wax)

ফ্যাটি এসিড ও মনোহাইড্রক্সি অ্যালকোহলের (গ্লিসারল ব্যতীত) অ্যাস্টারকে মোম বলে। কোনো কোনো উদ্ভিদে প্রাপ্ত মোম ২৪-৩৬ কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট। মোমে ফ্যাটি এসিডের পরিসর C_{14} থেকে C_{36} এবং অ্যালকোহলের পরিসর C_{14} থেকে C_{36}। মোম পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়। এগুলো রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। এতে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় মোম কঠিন অবস্থায় থাকে। মোমের বিশেষ কোনো বর্ণ বা গন্ধ নেই। দৃঢ়ভাবে এগুলো পানিবিকর্ষী। মোমের গলনাঙ্ক চর্বির চেয়ে বেশি।

CamScanner

উৎস

প্রাণিজ উৎস : মৌচাক, পাখির পালক, লোম।

উদ্ভিদ উৎস : উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফলের ত্বক দেহাবরন পৃষ্ঠ ও ত্বককোষ থেকে নিঃসৃহ হয়।

বৈশিষ্ট্য :

i. মোম পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়।
ii. এরা রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়।
iii. এতে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে।
iv. সাধারণ তাপমাত্রায় মোম কঠিন।
v. এদের কোন বর্ণ ও গন্ধ নেই।
vi. দৃঢ়ভাবে পানি বিকর্ষী।
vii. গলনাঙ্ক চর্বির চেয়ে বেশী।

উদাহরণ–মোম বিভিন্ন রকমের হয়। উদ্ভিজ্জমোম, মৌ-মোম, ল্যানোলিন, সিবাম, সেরুমেন, সুবেরিন ইত্যাদি।

মোমের কাজ ও গুরুত্ব

১. মোম উদ্ভিদের কাণ্ড, বোঁটা, পাতা ও ফলের উপর **প্রতিরোধক স্তর** হিসেবে কাজ করে।
২. পাতা ও কচি কাণ্ডে কিউটিকল সৃষ্টির মাধ্যমে **প্রস্বেদন** কমাতে সাহায্য করে।
৩. মোমবাতি তৈরিতে মোম ব্যবহৃত হয়।
৪. বিভিন্ন প্রসাধন শিল্পে ও জীববিজ্ঞান গবেষণাগারের **ব্যবহারিক ট্রে** তৈরিতেও মোম ব্যবহৃত হয়।
৫. ফল সংরক্ষণেও এর ব্যবহার রয়েছে।

২. যৌগিক লিপিড (Compound lipids)

সরল লিপিডের সঙ্গে অন্য কোনো **প্রোসথেটিক গ্রুপ** (জৈব বা অজৈব পদার্থ) সংযুক্ত হয়ে যে লিপিড গঠিত হয়, তাদের যৌগিক লিপিড বলে। নিচে কয়েকটি প্রধান প্রধান যৌগিক লিপিড বর্ণনা করা হলো–

i. ফসফোলিপিড (Phospholipids) : ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল ও ফসফেট সমন্বয়ে গঠিত লিপিডকে ফসফোলিপিড বলে। ফসফোলিপিডের একটি বিশেষ উপাদান হলো **ফসফাইডিক এসিড**। ফসফাইডিক এসিডের ফসফেট গ্রুপে কোলিন যুক্ত হলে লেসিথিন উৎপন্ন হয়। লেসিথিনই হলো প্রথম শনাক্তকৃত ফসফোলিপিড। উদাহরণ–লেসিথিন, প্লাজমালোজেন, সেফালিন, কার্ডিওলিপিন, স্ফিংগোমায়োলিন ইত্যাদি।

কাজ

১. কোষঝিল্লি ও সকল কোষীয় অঙ্গাণুর ঝিল্লির **গঠনগত উপাদান** হিসেবে বিদ্যমান থাকে।
২. কোষের **ভেদ্যতা ও পরিবহন প্রক্রিয়া** নিয়ন্ত্রণ করে।
৩. কোষের **আয়ন বাহক** হিসেবে কাজ করে।
৪. **রক্ত তঞ্চনে** অংশগ্রহণ করে।

ii. গ্লাইকোলিপিড Glycolipids) : ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল ও কার্বোহাইড্রেট সমন্বয়ে গঠিত লিপিডকে গ্লাইকোলিপিড বলে। অন্যভাবে বলা যায়, সরল লিপিডের সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট থাকলে সে যৌগকে গ্লাইকোলিপিড বলে। সূর্যমুখী ও তুলার বীজে গ্লাইকোলিপিড শনাক্ত করা হয়েছে। ক্লোরোপ্লাস্টের মেমব্রেনে 'গ্লাইকোলিপিড গ্লিসারাইড' নামক গ্লাইকোলিপিড থাকে। সেরিব্রোসাইড নামক গ্লাইকোলিপিড মেরুদণ্ডী প্রাণীতে বিদ্যমান। উদাহরণ–গ্যাংলিওসাইড, সেরিব্রোসাইড ইত্যাদি।

কাজ

১. ফটোসিনথেটিক অঙ্গাণু (ক্লোরোপ্লাস্ট) গঠন করে **সালোকসংশ্লেষণে** (ফটোসিনথেসিস) ভূমিকা রাখে।
২. প্রাণিদেহে নিউরনের **মায়োলিন শিথ** গঠন করে।

CamScanner

iii. **সালফোলিপিড (Sulpholipids) :** যে গ্লাইকোলিপিডে সালফার থাকে তাকে **সালফোলিপিড** বলে। ক্লোরোপ্লাস্টে এ যৌগটি অধিক পরিমাণে থাকে।

iv. **লিপোপ্রোটিন (Lipoprotein) :** লিপিডের সাথে প্রোটিন যুক্ত হয়ে যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ গঠন করে তাকে **লিপোপ্রোটিন** বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের লিপিড অংশ কোলেস্টেরল, এস্টার এবং ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত থাকে। কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট আবরণীতে লিপোপ্রোটিন থাকে। প্রাণিদেহে রক্তরস, ডিমের কুসুম ও দুধে পাওয়া যায়। উদাহরণ : কিউটিন, সুবেরিন ইত্যাদি।

লিপিড প্রোফাইল

রক্তে কোলেস্টেরল ও চর্বির মাত্রা দেখতে **লিপিড প্রোফাইল** পরীক্ষাটি করা হয়। লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষায় টোটাল কোলেস্টেরল (TC), লো-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (LDL), হাই-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (HDL) ও ট্রাইগ্লিসারাইড (TG) এর মাত্রা দেখা হয়। নিচের ছক থেকে সহজেই লিপিড প্রোফাইল (mg/dl = milligram/deciliter) সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

American Heart Association, NEF III Guideline

Total cholesterol	: Desirable < 200 mg/dl;	Borderline 200-239;	High>240	
HDL	: Desirable > 40 mg/dl			
LDL	: Optimal < 100 mg/dl;	Borderline 130–159;	High > 160	
Triglyceride	: Normal < 150 mg/dl;	Borderline 150–199;	High > 200 – 499;	Veryhigh>500

৩. উদ্ভূত বা উৎপাদিত লিপিড (Derived lipids)

যৌগিক লিপিডের আর্দ্র বিশ্লেষণের ফলে যে লিপিড উদ্ভূত হয় তাকে **উদ্ভূত লিপিড** বলে। আবার যেসব যৌগ আইসোপ্রিন এককের (C_5H_8) পলিমার দিয়ে গঠিত তাকে **টারপিনয়েড লিপিড** বলে। আইসোপ্রিন হলো ৫ কার্বনবিশিষ্ট যৌগ। স্টেরয়েড, টারপিন্, রাবার ইত্যাদি টারপিনয়েড লিপিডের উদাহরণ। টারপিনয়েড লিপিড তিন প্রকার, যথা :

i. **স্টেরয়েডস (Steroids) :** চারটি ভিন্নতর কার্বন রিং এবং তাতে কার্বনের পার্শ্বশিকল নিয়ে গঠিত লিপিড হলো **স্টেরয়েড**। যে সব স্টেরয়েড-এ এক বা একাধিক হাইড্রক্সিল (–OH) গ্রুপ থাকে তাদেরকে বলা হয় **স্টেরল** (sterol)। ব্যাকটেরিয়া ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদে স্টেরল বিদ্যমান। এরা উদ্ভিদে মুক্ত অবস্থায় অথবা গ্লাইকোসাইড হিসেবে বিরাজমান থাকে। হৃৎপিণ্ডের চিকিৎসায় ডিজিটালিন ব্যবহৃত হয়। নিউরোস্পোরা ও ঈস্ট এ **আর্গোস্টেরল** পাওয়া যায়।

উদ্ভিজ্জ স্টেরয়েডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– **স্টিগমাস্টেরল** (stigmasterol-আঙ্গুর, নারকেল, সয়াবিনে), **β-সিটোস্টেরল** (β-sitosterol-দানাশস্যে), **স্পাইনেস্টেরল** (পালং, বাঁধাকপিতে) ইত্যাদি। আলু, চুপরিআলুতে সর্বোচ্চ পরিমাণে কোলেস্টেরল পাওয়া যায়।

কোলেস্টেরল : কোলেস্টেরল হলো সকল প্রাণীর চর্বিতে বিদ্যমান একটি সাধারণ স্টেরল যা প্লাজমামেমব্রেনের অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান, পিত্তলবণের প্রধান উপাদান এবং ভিটামিন-ডি এর পূর্বসূচক।

কোলেস্টেরল দুই প্রকার; যথা– (i) **লো-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন বা LDL** এবং (ii) **হাই-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন বা HDL**। মানুষের রক্তে কোলেস্টেরল বেশি থাকা ক্ষতিকর (রক্তে স্বাভাবিক মাত্রা ০.১৫–১.২০%)। রক্তে HDL বেশি থাকা মন্দ নয় তবে LDL বেশি থাকা খুবই ক্ষতিকর। স্ত্রীলোকের রক্তে HDL বেশি থাকে এবং LDL কম থাকে। এজন্য পুরুষ লোক অপেক্ষা স্ত্রীলোকের হৃদরোগ কম হয়। কোলেস্টেরল এর মাত্রা বেশি থাকলে রক্তনালি সরু হয়ে হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল কমে যায়। ফলে করোনারি থ্রম্বোসিস নামক হৃদরোগ হয়। রক্তে অতিমাত্রায় কোলেস্টেরল ধমনির লুমেন (ছিদ্র) বন্ধ করে দিতে পারে। মানুষের রক্তে HDL এর মাত্রা বেশি (>40 mg/dl) থাকা ভালো। তবে LDL এর মাত্রা কম (<100 mg/dl) থাকা ভালো।

CamScanner

স্টেরয়েডের কাজ : (i) কিছু স্টেরয়েড যৌন হরমোন হিসেবে কাজ করে। (ii) কর্টিসল কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন হজম, পানি ও লবণ ভারসাম্য এবং যৌন বিকাশে ভূমিকা রাখে। (iii) ওষুধ হিসেবেও স্টেরয়েডের ভূমিকা আছে যেমন– ডিজিট্যালিন হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। (iv) আর্গোস্টেরল UV- রশ্মির প্রভাবে ভিটামিন D-তে পরিণত হয়।

ii. টারপিন্স (Terpenes) : ১০ থেকে ৪০টি কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট আইসোপ্রিনয়েড যৌগকে টারপিন্স বলে। এর সাধারণ সংকেত হলো $(C_5H_8)n$। বিভিন্ন উদ্ভিদে এদের পাওয়া যায়, যেমন– পুদিনার মেনথল, পাইনের পাইনিন, লেবুর লেমনিন ইত্যাদি। এ ছাড়াও তুলসী পাতাতে উদ্বায়ী তেল থাকে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মনোটারপিনস হলো– মেনথল, লেমনিন, জিরানিয়ল ইত্যাদি।

কাজ : (i) বার্ণিশের কাজে, (ii) ওষুধ তৈরীতে (iii) কোমলপাণীয় তৈরীতে (iv) সুগন্ধি প্রসাধনী সামগ্রী তৈরীতে।

iii. রাবার (Rubber) : প্রায় ৩০০০ – ৬০০০ হাজার আইসোপ্রিন একক যুক্ত হয়ে রাবার তৈরী হয়। *Hevea brasiliensis* (গোত্র– Euphorbiaceae) থেকে প্রাকৃতিক রাবার (প্যারা রাবার) পাওয়া যায়। এছাড়া *Ficus elastica* (ভারতীয় রাবার), *Palaquium gutta, Castilla elastica, Manigot glaziovii, Achras* sp. ইত্যাদি বৃক্ষের কষ থেকেও সামান্য পরিমাণ রাবার সংগ্রহ করা যায়। প্রাকৃতিক রাবার ছাড়াও কৃত্রিম উপায়ে রাবার উৎপাদন করা হয়। এদেরকে গাম রাবার বলে। বিশ্বের প্রায় ৮০% শিল্পের সাথে রাবার জড়িত।

ব্যবহার : ট্রাক, বাস, মোটরগাড়ি, রিক্সা, সাইকেল ইত্যাদির টায়ার, টিউব তৈরি করার জন্য রাবার ব্যবহৃত হয়। চুইংগাম, খেলনা, আঠা, ইরেজার, গ্লাভস, রাবার ব্যান্ড এবং গামেন্টস শিল্পেও ব্যবহৃত হয়।

লিপিডের রাসায়নিক উপাদান

লিপিড প্রধানত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত হয়। এছাড়াও লিপিডে ফসফরাস, সালফার ও নাইট্রোজেন থাকতে পারে। সাধারণত গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডই বেশির ভাগ লিপিডে থাকে (স্নেহ দ্রব্য)। মোম জাতীয় লিপিডে গ্লিসারলের পরিবর্তে অ্যালকোহল বা কোলেস্টেরল থাকে। লিপিড সাধারণত তেল, চর্বি, মোম ও আরও সমজাতীয় উপাদান নিয়ে গঠিত বলে এদেরকে হেটারোজেনাস বা মিশ্র গোষ্ঠী যৌগ বলা হয়।

ভিন্নধর্মী লিপিডসমূহ

❐ ক্যারোটিনয়েডস (Carotenoids) : এরা আলোক শোষণকারী অর্গানিক পিগমেন্ট যা ৪টি আইসোপ্রিন একক থেকে উদ্ভূত। প্রায় 600 ধরনের ক্যারোটিনয়েডস আছে, এদের মধ্যে বিটা-ক্যারোটিন হচ্ছে কমলা বর্ণের পিগমেন্ট যার আণবিক সংকেত $C_{40}H_{56}$। এটি আলোকশক্তি শোষণ করে সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে এবং আলোক অনুধাবন করে ফটোট্রপিজম ঘটায়। মানবদেহে বিটা-ক্যারোটিন ভেঙে দুই অণু ভিটামিন-A তৈরি করে, যা থেকে পরে রোডোপসিন (rhodopsin) তৈরি হয়। রোডোপসিন দৃষ্টিশক্তি দান করে। গাজর, টমেটো, ডিমের কুসুম, মিষ্টি আলু ইত্যাদি হলো বিটা-ক্যারোটিন এর উৎস।

❐ ভিটামিনসমূহ (Vitamins) : ক্যারোটিনয়েড এর মতো কতক ভিটামিন ও আইসোপ্রিনের রাসায়নিক পরিবর্তন ও সংযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এগুলো চর্বিতে দ্রবণীয় কিন্তু পানিতে অদ্রবণীয়। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো–

১. ভিটামিন–A : এটি ক্যারোটিনয়েড থেকে উৎপন্ন হয়। এর অভাবে রাতকানা ও ত্বক শুষ্ক হয় এবং বৃদ্ধি রহিত হয়।
২. ভিটামিন–D : এটি অন্ত্র কর্তৃক ক্যালসিয়াম শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে হাড়জনিত (যেমন–রিকেট, অস্টিওম্যালেশিয়া) বিভিন্ন রোগ হয়।
৩. ভিটামিন-E : একদল লিপিড ভিটামিন-E হিসেবে পরিচিত। এরা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার ক্ষতিকর দিক থেকে কোষকে রক্ষা করে।
৪. ভিটামিন-K : সবুজ শাকসব্জিতে ভিটামিন-K পাওয়া যায়। আন্ত্রিক ব্যাকটেরিয়াও এটি তৈরি করে। এরা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো ভিটামিন B ও C এবং পানিতে অদ্রবণীয় ভিটামিন হলো ভিটামিন A, D, E এবং K।

জীবদেহে লিপিডের ভূমিকা (Role of Lipids in Living Body)

১. লিপিড জীবদেহে খাদ্য হিসেবে **সঞ্চিত থাকে**। বীজের শস্যে লিপিড জমা থাকে এবং অঙ্কুরোদগমের সময় প্রয়োজনীয় **শক্তি সরবরাহ** করে।
২. কোষঝিল্লি থেকে শুরু করে অধিকাংশ **কোষ অঙ্গাণুর আবরণী** ফসফোলিপিড দিয়ে গঠিত।
৩. গ্লাইকোলিপিড **সালোকসংশ্লেষণে** বিশেষ ভূমিকা রাখে।
৪. ফসফোলিপিড কোষের **আয়নের বাহক** হিসেবেও কাজ করে।
৫. লিপিড পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো B ও C এবং পানিতে অদ্রবণীয় ভিটামিন হলো A, D, E ও K।
৬. ফসফোলিপিড জীবদেহের কতিপয় উৎসেচকের (এনজাইম) **প্রোস্থেটিক গ্রুপ** হিসেবে কাজ করে।
৭. প্রাণিদেহের ত্বকের নিচে সঞ্চিত চর্বি তাপ **নিরোধক হিসেবে** কাজ করে।
৮. মোম জাতীয় কিছু লিপিড উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতার কিউটিকলে বিদ্যমান থেকে **প্রস্বেদনের হার হ্রাস** করে।
৯. টারপিনস জাতীয় লিপিড উদ্ভিদে **সুগন্ধি সৃষ্টি** করে।
১০. লিপিড থেকে সামান্য প্রোটিন (লিপোপ্রোটিন), হরমোন এবং কোলেস্টেরল সংশ্লেষিত হয়।

প্রধান প্রধান লিপিড-এর প্রকার, গঠন ও কাজ

প্রকার	গঠন	কাজ	উদাহরণ
১. ফ্যাটি এসিড	হাইড্রোকার্বন চেইনের সাথে কার্বোক্সিল গ্রুপ সংযুক্ত।	কোষীয় কাজ এবং শক্তি সঞ্চয়	স্টিয়ারিক এসিড
২. ফ্যাট	গ্লিসারলের সাথে ৩টি ফ্যাটি এসিড সংযুক্ত।	শক্তি সঞ্চয় এবং ইনসুলেশন	বাটার
৩. ফসফোলিপিড	২টি ফ্যাটি এসিড চেইন এবং ১টি ফসফেট গ্রুপ গ্লিসারলের সাথে সংযুক্ত।	কোষঝিল্লি গঠন	লিপিড বাইলেয়ার
৪. স্টেরয়েড	চারকার্বন রিংবিশিষ্ট	হর্মোনাল সিগনালিং, বৃদ্ধি, পরিবেশের প্রতি কোষের সাড়া প্রদান	কোলেস্টেরল, টেস্টোস্টেরন
৫. ওয়াক্স	লম্বা একটি এসিড চেইন অ্যালকোহল বা কার্বন রিং-এর সাথে সংযুক্ত।	পানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা দান	পাতা, কাণ্ড ও ফলে মোমের আস্তর

এনজাইম (Enzyme) বা উৎসেচক

জীবকোষে বিদ্যমান যেসব প্রোটিনধর্মী জৈব যৌগ স্বল্পমাত্রায় উপস্থিত থেকে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে; কিন্তু বিক্রিয়ার শেষে নিজে অপরিবর্তিত থাকে, তাদের এনজাইম বা উৎসেচক বলে। এনজাইমকে **জৈব অনুঘটকও** (organic catalyst) বলা হয়ে থাকে। সজীব কোষে এনজাইম উৎপন্ন হলেও কোষের ওপর তাদের সক্রিয়তা নির্ভর করে না। **উইলহেম কুন** (Wilhelm Kuhne, 1878) সর্বপ্রথম **এনজাইম** (Enzyme) শব্দটি ব্যবহার করেন। জার্মান বিজ্ঞানী **এডুয়ার্ড বুকনার** (Eduard Buchner, 1897) ঈস্টের নির্যাস থেকে সর্বপ্রথম **জাইমেজ** (Zymase) এনজাইম পৃথক করেন এবং তিনি এজন্য 1907 সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। **জেমস বি. সামার** (James B. Sumner 1926) উদ্ভিদকোষ থেকে **ইউরিয়েজ** (urease) এনজাইমকে পৃথক করে কেলাসিত করেন এবং 'Enzymes are Proteins' বলে অভিহিত করেন। **সকল এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়।** এ পর্যন্ত প্রায় ৪,৫০০ ধরনের এনজাইম আবিষ্কৃত হয়েছে। এনজাইমে অ্যামিনো এসিডের সংখ্যা সর্বনিম্ন ৬২ থেকে সর্বোচ্চ ২৫০০ পর্যন্ত হতে পারে।

এনজাইম কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার মৌলে গঠিত। কিছু কিছু এনজাইমে ফসফরাস, তামা, দস্তা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি মৌল থাকে বলে জানা গেছে।

CamScanner

এনজাইমের বৈশিষ্ট্য বা ভৌত-রাসায়নিক ধর্ম

১. এনজাইম প্রধানত প্রোটিনধর্মী।
২. জীবকোষে এরা কলয়েড (colloid) রূপে থাকে।
৩. এনজাইম প্রধানত পানি, অ্যালকোহল এবং গ্লিসারলে দ্রবণীয়। এরা পানিতে অদ্রবণীয়।
৪. এনজাইমের অণু বৃহদাকার এবং অধিক আণবিক ওজনবিশিষ্ট হয়।
৫. এনজাইম তাপপ্রবণ (heat sensitives) অর্থাৎ সাধারণত 35°– 40°C তাপমাত্রায় এনজাইম অধিক ক্রিয়াশীল। অধিক তাপে এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কম তাপে নষ্ট হয় না, তবে তার কার্যকারিতা কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়।
৬. একটি নির্দিষ্ট এনজাইম একটি নির্দিষ্ট pH মাত্রায় সর্বাধিক সক্রিয় (যেমন– পেপসিন, pH = 2.0 এবং ট্রিপসিন, pH = 8.3)।
৭. এনজাইমের কার্যকারিতা সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট এনজাইম শুধু একটি নির্দিষ্ট বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।
৮. এনজাইম বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থার কোনো পরিবর্তন করে না, কেবল বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে।
৯. এরা খুব স্বল্প মাত্রায় বিদ্যমান থেকে বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে।
১০. একটি নির্দিষ্ট এনজাইম কেবল একটি নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেটের (substrate) ওপর ক্রিয়াশীল।
১১. এনজাইম অনুঘটকরূপে কাজ করে এবং বিক্রিয়া শেষে নিজে অপরিবর্তিত থাকে।
১২. এনজাইম শুধু জীবিত কোষেই উৎপন্ন হয় এবং কার্যকর হওয়ার আগে এদের পানির প্রয়োজন হয়।
১৩. প্রখর আলো বিশেষ করে অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে এনজাইমের কর্মক্ষতা নষ্ট হয়।

এনজাইমের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

i. সব এনজাইমই প্রোটিন জাতীয়, তাই প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো এসিডই এনজাইমসমূহের মূল গাঠনিক উপাদান।
ii. একটি সুনির্দিষ্ট এনজাইমের অ্যামিনো এসিড সংখ্যা ও অনুক্রম সুনির্দিষ্ট।
iii. ভিন্ন ভিন্ন এনজাইমের অ্যামিনো এসিডের সংখ্যা ও অনুক্রম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।
iv. এনজাইম অম্লীয় ও ক্ষারীয় উভয় পরিবেশেই ক্রিয়াশীল।
v. কো-এনজাইম, কো-ফ্যাক্টর ইত্যাদির উপস্থিতিতে এনজাইমের ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।
vi. এনজাইম সাধারণত পানি, গ্লিসারল ও লঘু অ্যালকোহলে দ্রবণীয়।
vii. অ্যামোনিয়াম সালফেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পিকরিক এসিড ইত্যাদির দ্বারা এনজাইম অধঃক্ষেপিত হয়।
viii. উচ্চ তাপ (50 – 100°C), অতি বেগুনি রশ্মি ইত্যাদির প্রভাবে এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

এনজাইমের নামকরণ

সাধারণত তিনটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। যথা– ১. সাবস্ট্রেট এর ধরন অনুসারে, ২. বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে এবং ৩. সাবস্ট্রেট-বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে।

১. সাবস্ট্রেট-এর ধরন অনুসারে

এনজাইম যার ওপর ক্রিয়া করে তাকে বলা হয় সাবস্ট্রেট (substrate)। যে সাবস্ট্রেট তথা যে পদার্থের ওপর এনজাইম ক্রিয়া করে তার শেষে- 'এজ' (ase) যোগ করে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। যেমন–

সাবস্ট্রেট		এনজাইম
i. সুক্রোজ–এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	সুক্রেজ
ii. ইউরিয়া–এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	ইউরিয়েজ
iii. আরজিনিন–এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	আরজিনেজ
iv. টাইরোসিন–এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	টাইরোসিনেজ
v. লিপিড-এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	লাইপেজ
vi. প্রোটিন–এর সাথে 'এজ' যোগ করে	=	প্রোটিয়েজ

CamScanner

২. বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে

এনজাইম যে ধরনের বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত বা প্রভাবিত করে সেই বিক্রিয়ার নামের প্রথমাংশের সাথে 'এজ' যোগ করে এনজাইমের নামকরণ করা হয়। একটি ছকের মাধ্যমে এটি দেখানো হলো।

বিক্রিয়ার নাম	+এজ	এনজাইমের নাম
১. হাইড্রোলাইসিস	+এজ	= হাইড্রোলেজ
২. অক্সিডেশন	+এজ	= অক্সিডেজ
৩. রিডাকশন	+এজ	= রিডাকটেজ
৪. আইসোমারাইজেশন	+এজ	= আইমারেজ

৩. সাবস্ট্রেট-বিক্রিয়ার মিলিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে

সাবস্ট্রেটের সাথে এনজাইমের নাম যোগ করে এ জাতীয় নামকরণ করা হয়। সাধারণত বিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে এ জাতীয় নামকরণ করা হয়। যেমন সাবস্ট্রেট হেক্সোজ (গ্লুকোজ) এবং এনজাইম কাইনেজ, তাই যুক্তনাম দেয়া হয়েছে **হেক্সোকাইনেজ**। গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ-৬-ফসফেট সৃষ্টিকালে এ এনজাইম কার্যকরী হয়। ফসফোইনল পাইরুভিক এসিড থেকে পাইরুভিক এসিড তৈরির বিক্রিয়ার এনজাইমের নাম পাইরুভিক এসিড কাইনেজ। এমনইভাবে ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ, ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ ইত্যাদি।

উপরোক্ত পদ্ধতি ছাড়াও কিন্তু এনজাইমের নামকরণ হয়, যথা– পেপসিন, ট্রিপসিন, রেনিন ইত্যাদি।

প্রোস্থেটিক গ্রুপ, কো-ফ্যাক্টর, কো-এনজাইম

- যে এনজাইম শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত তাকে সরল **এনজাইম** (simple enzyme) বলে। কোন কোন এনজাইমে প্রোটিন অংশের সাথে একটি অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে। এ ধরনের এনজাইমকে তথা প্রোটিনকে **কনজুগেটেড প্রোটিন** (conjugated proteins) বলা হয়।
- কনজুগেটেড প্রোটিন (এনজাইম) এর প্রোটিন অংশকে **অ্যাপোএনজাইম** (apoenzyme) বলে।
- কনজুডেটেড প্রোটিন এর অপ্রোটিন অংশকে বলা হয় **প্রোস্থেটিক গ্রুপ**।
- অ্যাপোএনজাইম ও প্রোস্থেটিক গ্রুপকে **এনজাইম** বলে।
- প্রোস্থেটিক গ্রুপটি কোন মেটাল (metal) ধাতুর আয়ন হলে তাকে **কো-ফ্যাক্টর** (co-factor) বলা হয়। পূর্বে একে **অ্যাকটিভেটর** বলা হতো।
- এনজাইমের প্রোস্থেটিক গ্রুপটি কোন জৈব রাসায়নিক যৌগ হলে তাকে **কো-এনজাইম** (co-enzyme) বলে।

কো-এনজাইম : এনজাইমের সাথে প্রোস্থেটিক গ্রুপ হিসেবে কোনো অপ্রোটিন জৈব অণু শিথিলভাবে যুক্ত থাকলে তাকে **কো-এনজাইম** বলে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কো-এনজাইম হলো–

i. **FAD** = Flavin Adenine Dinucleotide : এটি ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের সাথে কাজ করে এবং উৎপন্ন যৌগ হতে হাইড্রোজেন বিমুক্ত ও গ্রহণ করে $FADH_2$ তে পরিণত করে।
$FADH_2$ = Redueed Flavin Adenine Dinucleotide

ii. **FMN** = Flavin Mononucleotide (ভিটামিন B_2- মনোফসফেট)

iii. **NAD** = Nicotinamide Adenine Dinucleotide : এটি ডিহাইড্রেজিনেজ এনজাইমের সাথে কাজ করে এবং উৎপন্ন যৌগ হতে হাইড্রোজেন বিমুক্ত ও গ্রহণ করে $NADH + H^+$ তে পরিণত করে।
$NADH + H^+$ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide

iv. **NADP** = Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate
NADPH + H+ = Reduced Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate

CamScanner

v. **CoA=Co-enzyme A :** ভিটামিন-B, পাইরোফসফেট ও অ্যাডিনাইলিক এসিড নিয়ে কো-এনজাইম-A গঠিত। ফ্যাটি এসিড বিপাক, সাইট্রিক এসিড চক্র, স্টেরল ও অ্যাসিটিল কোলিন সংশ্লেষণে Co-A বিশেষভাবে কাজ করে।

vi. **ATP = Adenosine Triphosphate :** এক অণু অ্যাডেনিন, এক অণু রাইবোজ শর্করা এবং তিন অণু ফসফেট নিয়ে ATP গঠিত। এরা কোষের বিভিন্ন ধরনের বিপাক ক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে।

এনজাইম ও কো-এনজাইম এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	এনজাইম	কো-এনজাইম
১. প্রকৃতি	এনজাইম একটি বড় প্রোটিন অণু। অর্থাৎ প্রোটিনধর্মী।	কো-এনজাইম প্রোটিন অণুর একটি অপ্রোটিন অংশ (জৈব রাসায়নিক যৌগ)।
২. আণবিক ওজন	এনজাইমের আণবিক ওজন ১২০০০–১০,০০,০০০০ ডাল্টন।	কো-এনজাইম অংশের আণবিক ওজন অনেক কম (৫০০ ডাল্টন–এর কাছাকাছি)।
৩. কাজ	এনজাইম স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে।	কো-এনজাইম স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ প্রোটিন অংশ ব্যতীত কাজ করতে পারে না।
৪. তাপের প্রভাব	৫০°C– ৬০°C তাপমাত্রায় এনজাইমের কার্যকারিতা থাকে না। অর্থাৎ তাপে নষ্ট হয়।	কো-এনজাইমের তাপমাত্রা সহন ক্ষমতা অনেক বেশী। তাই ঐ তাপমাত্রায় কো-এনজাইম অকেজো হয় না।
৫. ডায়ালাইসিস	এটি ডায়ালাইসিস করা যায় না।	এটি ডায়ালাইসিস করা যায়।
৬. ভিটামিন	কোন ভিটামিন এনজাইম হিসেবে কাজ করে না।	অনেক ভিটামিন কো-এনজাইম হিসেবে কাজ করে।
৭. উদাহরণ	প্রোটিয়েজ, লাইপেজ ইত্যাদি।	ATP, NAD, FAD ইত্যাদি।

এনজাইমের ক্রিয়ার প্রকৃতি (Nature of Enzyme Action)

এনজাইমের কাজ হলো কোনো বিক্রিয়ক বা সাবস্ট্রেটকে ভেঙে এক বা একাধিক বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ বা প্রোডাক্টে পরিণত করা। সাবস্ট্রেটটি প্রোডাক্টে পরিণত হওয়ার সময় তাকে **শক্তির বাধা** (energy barrier) অতিক্রম করতে হয়। এই বাধা অতিক্রম করতে যে শক্তি ব্যয় করতে হয় তাকে **কার্যকরী শক্তি বা সক্রিয়করণের শক্তি** (energy of activation) বলে।

☐ **সক্রিয় স্থান বা অ্যাকটিভ সাইট (Active site) :** এনজাইমের এক বা একাধিক সক্রিয় স্থান বা অ্যাকটিভ সাইট থাকে। এ স্থানেই সাবস্ট্রেট যুক্ত হয়।

☐ **অ্যালোস্টেরিক সাইট (Allosteric site) :** এ স্থানে কিছু এনজাইমের বিশেষ অণু বা ইফেক্টর যুক্ত হয়, যা ঐ এনজাইমের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যালোস্টেরিক এনজাইমের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে effector নামক বিশেষ অণু। ইফেক্টর, এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট ছাড়া অ্যালোস্টেরিক সাইট-এ সংযুক্ত হয়ে অ্যাক্টিভেটর হিসেবে অথবা ইনহিবিটর হিসেবে কাজ করে।

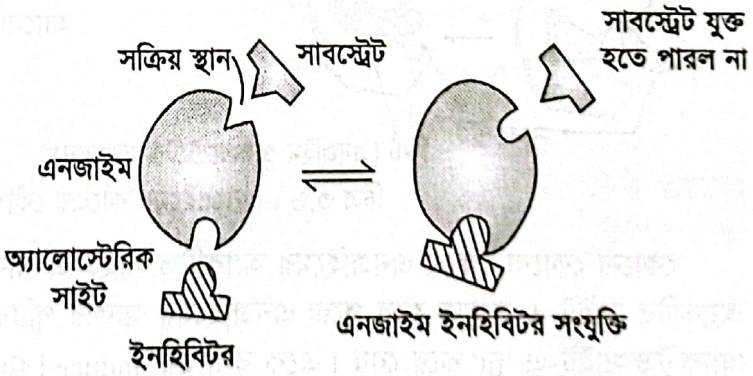

চিত্র ৩.৪ : এনজাইমের বিভিন্ন সাইট ও ইনহিবিটরের ভূমিকা

যেসব পদার্থ এনজাইমের কাজে বিঘ্ন ঘটায়, তারাই **ইনহিবিটর**, যেমন– 'ট্রিপ্টোফ্যান সিন্থেটেজ' এর ইনহিবিটর হচ্ছে **ট্রিপ্টোফ্যান**। ইফেক্টর যদি বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে তাহলে তাকে **অ্যাকটিভেটর বা ইনডিউসার** বলে; যেমন- β-গ্যালাক্টোসাইডেজ এনজাইমের ইনডিউসার হচ্ছে **ল্যাক্টোজ**।

CamScanner

কিছু কিছু এনজাইম আছে যাদের একাধিক সাবইউনিট থাকে। এদের আকৃতি ও কাজ সহজেই পরিবর্তনশীল হতে পারে। এ ধরনের এনজাইমকে বলা হয় Allosteric enzymes।

যেকোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছুটা অতিরিক্ত শক্তির দরকার হয়। এই অতিরিক্ত শক্তিকে **কার্যকরী শক্তি** বলে। এনজাইম-সাবস্ট্রেট এর কার্যকরী শক্তি কম। তাই কম কার্যকরী শক্তিসম্পন্ন সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের সাথে যুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে, ফলে বিক্রিয়ার হার বেড়ে যায়।

এনজাইমের কাজের কৌশল (Mechanism of Enzyme Action) বা কর্মপদ্ধতি

কোনো নির্দিষ্ট এনজাইমের এক বা একাধিক **সক্রিয় স্থান** বা **অ্যাকটিভ সাইট** (active site) থাকে। জার্মান রসায়নবিদ **Emil Fischer** (১৮৯৪) এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট প্রস্তাব করেন। পলিপেপটাইড চেইনের ফৌলডিং-এর মাধ্যমে অ্যাকটিভ সাইট সৃষ্টি হয়। অ্যাকটিভ সাইট ও সাবস্ট্রেটের সম্পর্ক হলো **তালা-চাবির মতো** সুনির্দিষ্ট।

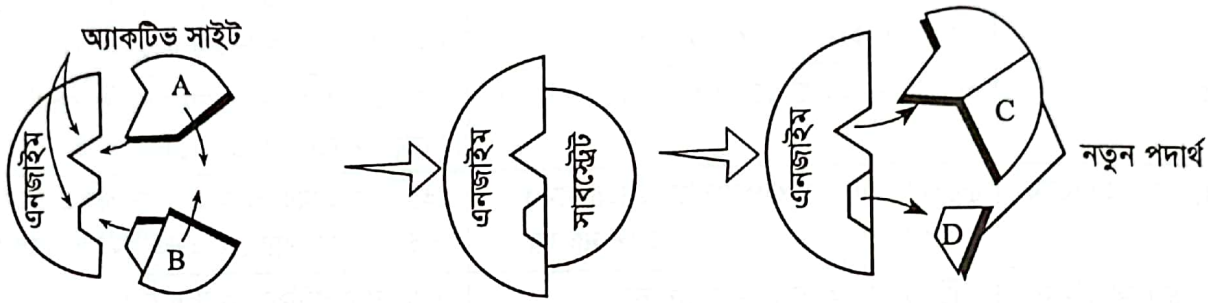

এনজাইম + সাবস্ট্রেট (A এবং B) → এনজাইম - সাবস্ট্রেট যৌগ → এনজাইম + প্রোডাক্ট (C এবং D)
উদাহরণ : সুক্রেজ + সুক্রোজ → সুক্রেজ - সুক্রোজ যৌগ → সুক্রেজ + প্রোডাক্ট (গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ)

চিত্র ৩.৫ : এনজাইমের ক্রিয়া কৌশল

(১) প্রথমে সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের সক্রিয় স্থান তথা **'অ্যাকটিভ সাইট'**-এ সংযুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টি করে।

(২) দ্বিতীয় পর্যায় এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ ভেঙে গিয়ে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং এনজাইম অপরিবর্তিতভাবে পৃথক হয়ে যায়।

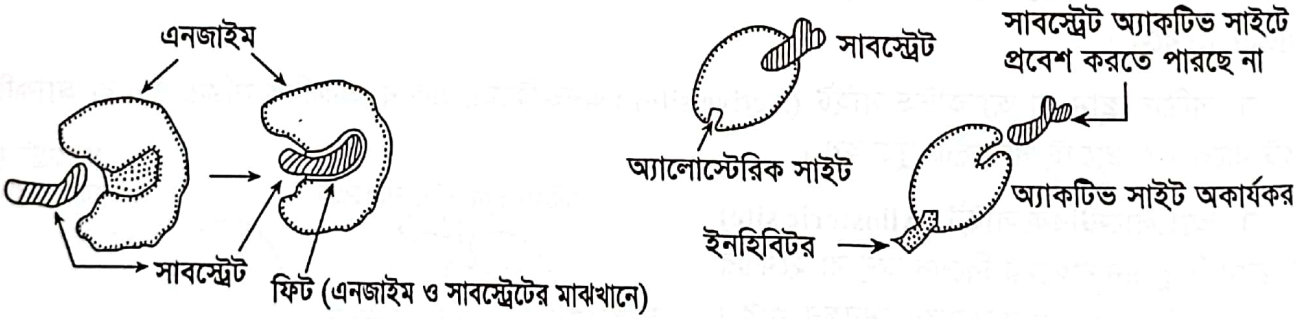

চিত্র ৩.৬ : এনজাইমের কাজের কৌশল : Induced fit ও inhibitor

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট-এ সাবস্ট্রেট সঠিকভাবে 'fit' হয় না। এসব ক্ষেত্রে সাবস্ট্রেট অ্যাকটিভ সাইট-এ সংযুক্ত হলে পুরো এনজাইমের আকার পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এনজাইম সাবস্ট্রেটকে সঠিকভাবে অ্যাকটিভ সাইট-এ 'fit' করে নেয়। একে বলা হয় 'induced fit'। এ কারণে তালা-চাবি মতবাদ পরিত্যাজ্য বলে মনে করা হয়। এনজাইমের ক্রিয়া কৌশলে induced fit প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ, তা না হলে বিক্রিয়াটি সূচারুরূপে সম্পন্ন হতো না।

কিছু কিছু পদার্থ এনজাইমের কাজে বাধাদান করে বা বিঘ্ন ঘটায়। এদেরকে **ইনহিবিটর** বলে। ইনহিবিটর (inhibitor) এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট-এ আগেই সংযুক্ত হয়ে যায়, ফলে সাবস্ট্রেট ঐ অ্যাকটিভ সাইট-এ আর যুক্ত হতে পারে না। ফলে এনজাইম কাজ করতে পারে না। আবার কতক ইনহিবিটর অ্যাকটিভ সাইট ছাড়া অন্য কোনো স্থানে সংযুক্ত হয়ে এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট নষ্ট করে ফেলে, কাজেই সাবস্ট্রেট সেখানে যুক্ত হতে পারে না।

CamScanner

এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাস

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে এনজাইমের সংখ্যা অনেক। অদ্যাবধি সহস্রাধিক এনজাইম শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। গঠন প্রকৃতি ও কী ধরনের বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তার উপর ভিত্তি করে এনজাইমকে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়।

ক. গঠন প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস

১. সরল এনজাইম : যে এনজাইমের সম্পূর্ণ অংশই শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত তাকে সরল এনজাইম বলা হয়। যেমন–সুক্রেজ, পেপসিন ইত্যাদি।

২. যৌগিক এনজাইম : যে এনজাইমের প্রোটিন অংশের সাথে একটি অপ্রোটিন অংশ সংযুক্ত থাকে তাকে যৌগিক এনজাইম বলে। এদেরকে এনজাইম-ও বলা হয়। এদের দুটি অংশ থাকে– একটি প্রোটিন অংশ অপরটি অপ্রোটিন অংশ। যেমন– FAD, NAD.

খ. কী ধরনের বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে তার উপর ভিত্তি করে এনজাইমসমূহকে নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

১. অক্সিডোরিডাকটেজ (Oxido-reductases) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন কিংবা ইলেকট্রন সংযুক্ত করে অথবা কোনো পদার্থ থেকে এগুলো বিযুক্ত করে। অক্সিজেন সংযোগ বা হাইড্রোজেন বিয়োজন বা ইলেকট্রন অপসারণকে বলা হয় **অক্সিডেশন** (oxidation) বা জারণ। আবার হাইড্রোজেন সংযোগ বা অক্সিজেন বিয়োজন বা ইলেকট্রন যোগ হলো **রিডাকশন** (reduction) বা বিজারণ। বাংলায় এদেরকে **জারণ-বিজারণ** (oxidation-reduction) এনজাইম বলা হয়। যেমন– সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, ফসফোগ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ ও অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ।

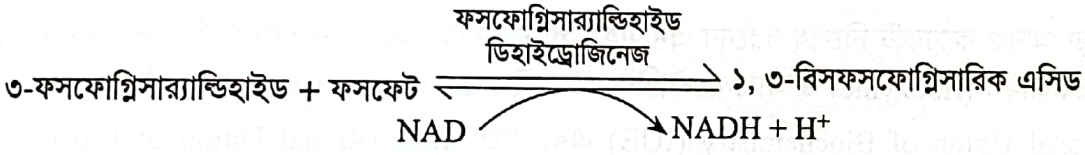

এখানে NAD বিজারিত হয়ে (হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে) NADH + H^+ তে পরিণত হয়েছে এবং ৩-ফসফোগ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড হাইড্রোজেন হারিয়ে জারিত (oxidized) হয়েছে।

২. ট্রান্সফারেজ (Transferase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো একটি পদার্থ হতে একটি গ্রুপকে (যেমন– NH_2) অপসারিত করে অন্য একটি পদার্থের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা করে; যেমন– কাইনেজ।

গ্লুটামিক এসিড + অক্সালো অ্যাসিটিক এসিড $\xrightarrow{\text{ট্রান্সফারেজ}}$ α- কিটোগ্লুটামিক এসিড + অ্যাসপারটিক এসিড

এক্ষেত্রে গ্লুটামিক এসিড হতে NH_2 গ্রুপ অপসারিত হয়ে অক্সালো অ্যাসিটিক এসিডের সাথে যুক্ত হয়ে তাকে অ্যাসপারটিক এসিডে পরিণত করেছে এবং নিজে α- কিটোগ্লুটামিক এসিডে পরিণত হয়েছে।

৩. হাইড্রোলাইটিক এনজাইম বা হাইড্রোলেজ (Hydrolase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের বিশেষ বন্ডের সাথে পানির অণু সংযুক্ত করে তাকে হাইড্রোলাইসিস (আর্দ্র-বিশ্লেষণ) করতে সহায়তা করে; যেমন– সুকরেজ, প্রোটিয়েজ, ফসফাটেজ, এস্টারেজ ইত্যাদি এ জাতীয় এনজাইম।

সুক্রোজ + পানি $\xrightarrow{\text{সুক্রেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ

৪. লাইয়েজ (Lyase) এনজাইম : এ শ্রেণির এনজাইম হাইড্রোলাইসিস ও জারণ-বিজারণ ছাড়াই অন্য কায়দায় সাবস্ট্রেটের কোনো মূলককে ট্রান্সফার (স্থানান্তর) করে থাকে। এরা কার্বন-কার্বন, কার্বন-অক্সিজেন, কার্বন-নাইট্রোজেন প্রভৃতি যোজকের ওপর কাজ করে; যেমন– অ্যালডোলেজ, আইসোসাইট্রেট লাইয়েজ, ফিউমারেজ, সাইট্রিক সিনথেটেজ ইত্যাদি।

ফ্রুক্টোজ ১, ৬ বিস ফসফেট $\xrightarrow{\text{অ্যালডোলেজ}}$ ৩–ফসফোগ্লিসারেল্ডিহাইড + ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট

CamScanner

৫. আইসোমারেজ (Isomerase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম অ্যালডোজ (aldose) এবং কিটোজ (ketose) শ্যুগার এর আইসোমেরিক পরিবর্তন সাধন করে; যেমন–ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ, মিউটেজ।

$$\text{গ্লুকোজ–৬-ফসফেট} \xrightarrow{\text{ফসফোগ্লুকো-আইসোমারেজ}} \text{ফ্রুক্টোজ–৬–ফসফেট}$$

৬. লাইগেজ (Lygase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম ATP- এর সহায়তায় দুই বা ততোধিক সাবস্ট্রেটকে সংযুক্ত করে নতুন যৌগ সৃষ্টি করে; যেমন–গ্লুটামিক সিনথেটেজ, অ্যাসিটাইল কো-এ সিনথেটেজ, পাইরুভেট কার্বোক্সিলেজ।

$$\text{গ্লুটামিক এসিড} + NH_3 + ATP \xrightarrow{\text{গ্লুটামিক সিনথেটেজ}} \text{গ্লুটামিন} + ADP + Pi$$

লাইগেজ এনজাইম ব্যবহার করে DNA প্রতিলিপনে ওকাজাকি খণ্ডসমূহ জোড়া লাগানো হয়।

৭. কার্বোক্সিলেজ (Carboxylase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে CO_2 অণু যুক্ত করতে অথবা কোনো পদার্থ হতে CO_2 বিযুক্ত করতে সহায়তা করে; যেমন– কার্বোক্সিলেজ।

$$\text{অক্সালো সাকসিকিন এসিড} \xrightarrow{\text{কার্বোক্সিলেজ}} \alpha\text{ - কিটোগ্লুটারিক এসিড} + CO_2$$

৮. এপিমারেজ (Apimerase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইমসমূহ কোনো পদার্থকে এর এপিমারে পরিণত করতে সহায়তা করে। এপিমার অণুগুলো কেবলমাত্র একটি কার্বন এটমের কনফিগারেশন দিয়ে পার্থক্যমণ্ডিত।

৯. ফসফোরাইলেজ (Phosphorylase) এনজাইম : এ জাতীয় এনজাইম কোনো পদার্থের সাথে ফসফেট গ্রুপ যুক্ত করতে বা কোনো পদার্থ হতে ফসফেট গ্রুপ বিচ্ছিন্ন করতে সহায়তা করে; যেমন– হেক্সোকাইনেজ।

$$\text{গ্লুকোজ} + ATP \xrightarrow{\text{ফসফোরাইলেজ (হেক্সোকাইনেজ)}} \text{গ্লুকোজ-৬-ফসফেট} + ADP$$

এছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ ধরনের এনজাইম পাওয়া যায়, যথা– কোয়াগুলেটিং এনজাইম (coagulating enzyme), রাইবোজাইম (ribozyme) ও অ্যালোস্টোরিক এনজাইম (allostoric enzyme) ইত্যাদি।

International Union of Biochemistry (IUB) এবং পরে International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) বিক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে এনজাইমকে ৬টি শ্রেণিতে ভাগ করেন। যথা–

এনজাইমের শ্রেণিবিন্যাসের সংক্ষিপ্তসার

ক্রমিক নং	শ্রেণি	বিক্রিয়া প্রকৃতি	উদাহরণ
১.	অক্সিডো-রিডাক্টেজ (Oxido-reductase)	জারণ-বিজারণ	অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ, সাইটোক্রোম অক্সিডেজ ইত্যাদি।
২.	ট্রান্সফারেজ (Transferase)	কার্যকরী মূলকের স্থানান্তর	হেক্সোকাইনেজ, ট্রান্সঅ্যামাইলেজ ইত্যাদি।
৩.	হাইড্রোলেজ (Hydrolase)	আর্দ্র বিশ্লেষণ	সুক্রোজ, ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ ইত্যাদি।
৪.	লাইয়েজ (Lyase)	দ্বিবন্ধনীকে সৃষ্টি বা অপসারিত করে গ্রুপ স্থানান্তর ঘটায়	অ্যালডোলেজ, ফিউমারেজ ইত্যাদি।
৫.	আইসোমারেজ (Isomerase)	আইসোমারাইজেশন ঘটায়	ফসফোগ্লুকো আইসোমারেজ, ম্যালেট আইসোমারেজ ইত্যাদি।
৬.	লাইগেজ (Ligase)	ATP জাতীয় যৌগের আর্দ্র বিশ্লেষণ ও বন্ধনী সৃষ্টি করে	গ্লুটামিন সিন্থেটেজ, সাকসিনিক থায়োকাইনেজ ইত্যাদি।

এনজাইমের কার্যকারিতার প্রভাবকসমূহ

১. তাপমাত্রা : ৮০ সে. এর উপরে এবং 0° সে. বা তার নিচের তাপমাত্রায় এনজাইমের কার্যকারিতা দারুণভাবে কমে যায়। ৩৫°C – ৪০°C তাপমাত্রায় এনজাইমের বিক্রিয়ার সবচেয়ে হার বেশি। তাই এই তাপমাত্রাকে পরম তাপমাত্রা (optimum temperature) বলা হয়।

CamScanner

২. **pH :** অতিরিক্ত অম্ল বা অতিরিক্ত ক্ষার-এ এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়। অধিকাংশ এনজাইমের ক্ষেত্রে pH ৬ – ৯ এর মধ্যে থাকে। এক একটি এনজাইমের এক একটি নির্দিষ্ট অপটিমাম pH থাকে।

এনজাইম	অপটিমাম pH
পেপসিন	২.০
ইনভারটেজ	৪.৫
সেলুবায়েজ	৫.০
ইউরিয়েজ	৭.০
ট্রিপসিন	৮.০

৩. **পানি :** কোষে পরিমিত পানির উপস্থিতিতে এনজাইমের কার্যকারিতা স্বাভাবিক থাকে। শুকনো বীজে পানি না থাকায় এনজাইম নিষ্ক্রিয় থাকে।

৪. **ধাতু :** কোনো কোনো ধাতুর (যেমন– Mg^{++}, Mn^{++}, Co, Ni) উপস্থিতি এনজাইমের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। আবার কোনো কোনো ধাতুর (যেমন – Ag, Zn, Cu) উপস্থিতি এনজাইমের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে।

৫. **সাবস্ট্রেট-এর ঘনত্ব :** সাবস্ট্রেট-এর ঘনত্বের ওপরও এনজাইমের কর্মক্ষমতা নির্ভরশীল। সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব বাড়লে এনজাইমের কর্মক্ষমতা বাড়ে এবং ঘনত্ব কমলে কর্মক্ষমতা কমে।

৬. **এনজাইমের ঘনত্ব :** এনজাইমের ঘনত্বের ওপরও এদের কর্মক্ষমতা নির্ভরশীল।

৭. **প্রোডাক্ট-এর ঘনত্ব :** প্রোডাক্ট-এর পরিমাণ বেড়ে গেলে বিক্রিয়ার হার কমে যেতে পারে।

৮. **অ্যাকটিভেটর :** অ্যাকটিভেটরের উপস্থিতিতে এনজাইমের বিক্রিয়ার হার বাড়ে।

৯. **প্রতিরোধক (ইনহিবিটর) :** এর দ্বারা এনজাইমের কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হয়।

এনজাইমের কাজ

১. এনজাইমের প্রধান কাজ হলো জীবদেহের শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়াগুলো পরিচালনা করে জীবদেহকে কর্মক্ষম রাখা।
২. জীবদেহের গঠন ও বৃদ্ধি সবই নিয়ন্ত্রিত হয় এনজাইমের কার্যক্রম দিয়ে।
৩. জীবদেহে শক্তি সঞ্চয়ের পেছনেও এনজাইম ক্রিয়াশীল, আবার শক্তি নির্গমনের পেছনেও এনজাইম ক্রিয়াশীল।
৪. এটি বিক্রিয়ার গতিকে বাড়ায় আবার বিক্রিয়ার পরে অপরিবর্তিত থাকে।
৫. স্বল্প পরিমাণ এনজাইম প্রচুর পরিমাণ সাবস্ট্রেটকে প্রোডাক্টে পরিণত করে।
৬. বিভিন্ন জটিল যৌগকে সরল যৌগে পরিণত করে দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য সংশ্লেষ করে।

স্টার্চ (শ্বেতসার) হাইড্রোলাইসিসের জন্য ১০০ সে. তাপমাত্রায় প্রয়োজন হলেও এনজাইমের প্রভাবে স্বাভাবিক দৈহিক পরিবেশে অন্ত্রে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের পরিপাক ঘটে এবং গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। এভাবে আমিষ, চর্বি ও অন্যান্য বড় অণুর জৈবিক বিশ্লেষণ স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটে থাকে। তাই অনেকে বলে থাকেন এনজাইমের সিস্টেমেটিক কার্যক্রমই হলো জীবন।

জৈবিক কার্যক্রমে এনজাইমের ব্যবহার

১. **সেলুলেজ (Cellulase) :** যে এনজাইম সেলুলোজকে হাইড্রোলাইসিস করে সেলুবায়োজ–উৎপন্ন করে তাকে সেলুলেজ বলে। উদ্ভিদদেহের প্রধান গাঠনিক পদার্থ হলো সেলুলোজ। মৃত উদ্ভিদদেহ পচে না গেলে সমস্ত পৃথিবী আজ মৃত উদ্ভিদ দিয়ে ভরা থাকত। সেলুলেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় এরা ক্রমান্বয়ে পচে মাটির সাথে মিশে যায়। তৃণভোজী প্রাণীদের পৌষ্টিক তন্ত্র থেকে সেলুলেজ এনজাইম ক্ষরণ হয় বলে তারা কাঁচা উদ্ভিদ পরিপাক করতে পারে। মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র থেকে সেলুলেজ এনজাইম ক্ষরণ হয় না।

সেলুলোজ $\xrightarrow{\text{সেলুলেজ}}$ সেলুবায়েজ $\xrightarrow{\text{সেলুবায়েজ}}$ গ্লুকোজ

CamScanner

সেলুলেজের ব্যবহার

i. কফি প্রক্রিয়াজাতকরণে সেলুলেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
ii. পেপার এন্ড পাল্প এবং বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হয়।
iii. ওয়াশিং পাউডার ও লন্ড্রি ডিটারজেন্টের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
iv. ফলের জুস ও বিভিন্ন ধরনের পানীয় উৎপাদনে সেলুলেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
v. ওষুধ শিল্পেও এর যথেষ্ট প্রয়োগ রয়েছে।

২. প্রোটিয়েজ (Protease) : যে এনজাইম প্রোটিনকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে তাকে প্রোটিয়েজ বলে। বীজের সঞ্চিত প্রোটিন অঙ্কুরোদগমের সময় প্রোটিয়েজ এনজাইমের কার্যকারিতায় ভেঙে যায় এবং তা দ্রুত ভ্রূণে স্থানান্তরিত হয়ে প্রয়োজনুযায়ী নতুন প্রোটিন তৈরি করে। আমরা যে প্রোটিন জাতীয় খাবার খাই তাও প্রোটিয়েজ এনজাইমের কার্যকারিতায় হজম হয়; ফলে আমাদের দেহ গঠিত হয়। প্রোটিয়েজভুক্ত এনজাইমগুলো হচ্ছে– পেপসিন, ট্রিপসিন ও প্যাপেইন।

প্রোটিয়েজের ব্যবহার

i. বিভিন্ন শিল্প, ওষুধ তৈরি এবং জীববিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় প্রোটিয়েজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
ii. বেকারি শিল্পেও এ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
iii. রক্ত তঞ্চন নিয়ন্ত্রণে প্রোটিয়েজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৩. অ্যামাইলেজ (Amylase) : স্টার্চ–এর প্রধান উপাদান হলো অ্যামাইলোজ। কোনো কোনো স্টার্চ-এর সবটুকুই অ্যামাইলোজ দিয়ে তৈরি। গ্লুকোজ একক সোজা চেইন-এর পলিমার সৃষ্টি করে স্টার্চ গঠন করে। যে এনজাইম অ্যামাইলোজের ওপর কার্যকর ভূমিকা পালন করে তাকে **অ্যামাইলেজ** বলে। অ্যামাইলেজ দু'ধরনের : যথা–আলফা অ্যামাইলেজ ও বিটা অ্যামাইলেজ। α-অ্যামাইলেজ সাবস্ট্রেটকে ভেঙে প্রথমে ডেক্সট্রিনে পরিণত করে। β- অ্যামাইলেজ পরে ডেক্সট্রিনকে ভেঙে মল্টোজে পরিণত করে।

অ্যামাইলেজের ব্যবহার

i. স্টার্চ থেকে বিয়ার ও মদ উৎপাদন শিল্পে অ্যামাইলেজ ব্যবহার হয়।
ii. কাপড় ও বাসনকোসন থেকে স্টার্চ অপসারণের জন্য ডিটারজেন্টে অ্যামাইলেজ ব্যবহার করা হয়।
iii. জটিল স্টার্চকে সরল চিনিতে পরিণত করতে পাউরুটি শিল্পে অ্যামাইলেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
iv. প্যানক্রিয়েটিক এনজাইম রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (replacement therapy) চিকিৎসায় এ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৪. ক্যাটালেজ (Catalase) : যে এনজাইম হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডকে ভেঙ্গে পানি এবং অক্সিজেনে পরিণত করে তাকে **ক্যাটালেজ** বলে। প্রায় প্রতিটি জীবকোষেই ক্যাটালেজ এনজাইম পাওয়া যায়। এরা হাইড্রোজেন **পারঅক্সাইড** (H_2O_2) কে ভেঙে **পানি** (H_2O) এবং **অক্সিজেন** (O_2) উৎপন্ন করে। এক অণু ক্যাটালেজ এনজাইম অল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ H_2O_2 অণুকে বিজারিত করে (ভেঙে) পানি ও অক্সিজেন–এ রূপান্তরিত করতে পারে।

$$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{ক্যাটালেজ}} 2H_2O + O_2$$

ক্যাটালেজের ব্যবহার

i. পনির তৈরির পূর্বে দুধ থেকে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড অপসারণে দুগ্ধ শিল্পে ক্যাটালেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
ii. বস্ত্রশিল্পে ক্যাটালেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
iii. চোখের কন্টাক্ট লেন্স (contact lens) পরিষ্কারের কাজে এ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৫. জাইমেজ (Zymase) : কতক ছত্রাক, বিশেষ করে ঈস্ট (yeast) জাতীয় ছত্রাক কোষে জাইমেজ এনজাইম বিদ্যমান। জাইমেজ এনজাইম একটু জটিল প্রকৃতির। ঈস্ট জাতীয় ছত্রাকে বিদ্যমান যে এনজাইম শর্করাকে ফার্মেন্টেশন

CamScanner

প্রক্রিয়ায় ইথাইল অ্যালকোহল ও CO_2 -এ পরিণত করে তাকে জাইমেজ বলে। অ্যালকোহল উৎপাদন ও বেকারি শিল্পে জাইমেজ এনজাইম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{জাইমেজ}} 2C_2H_5 - OH + 2CO_2$$

গ্লুকোজ ইথাইল অ্যালকোহল

জাইমেজের ব্যবহার

i. ঈস্ট থেকে জাইমেজ এনজাইম সংগ্রহ করে বদহজম হওয়া রোগীদের ওষুধ হিসেবে দেয়া হয়।
ii. অ্যালকোহল উৎপাদনে জাইমেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৬. লাইপেজ (Lipase) : যে সব এনজাইম লাইপোলাইসিস বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে লিপিডকে আর্দ্র-বিশ্লেষণ করে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে তাকে **লাইপেজ** বলে। অধিকাংশ প্রাণিদেহে লাইপেজ এনজাইম লিপিড জাতীয় খাদ্যের পরিপাক, পরিবহন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রধান ভূমিকা রাখে।

লাইপেজের ব্যবহার

i. দই ও পনির শিল্পে লাইপেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
ii. বেকারি শিল্পে, ডিটারজেন্ট শিল্পে ও জৈব অণুঘটক হিসেবেএ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
iii. অগ্ন্যাশয়ের বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে লাইপেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহারিক জীবনে এনজাইমের প্রয়োগ/গুরুত্ব

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এনজাইমের ব্যবহার বহুবিধ। নিম্নে এনজাইমের এ বহুমুখী ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

১. ফলের রস তৈরি (Preparing fruit juice) : আম, কমলালেবু, আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের রস তৈরিতে এনজাইম ব্যবহার করা হয়। এসব ফলের রস তৈরিকালে **পেকটিন** নামক এনজাইম ব্যবহার করলে রসের ঘোলাটে অবস্থা কেটে যায় এবং রস পরিষ্কার ও স্বাদযুক্ত হয়।

২. পনির তৈরি (Making cheese) : দুধ থেকে পনির তৈরিতে **রেনিন** এনজাইম ব্যবহৃত হয়। রেনিন এনজাইম দুধের ননীকে জমাট বাঁধতে সহায়তা করে এবং পরে ননী থেকে পনির তৈরি করা হয়।

৩. কাপড়ে দাগ মোচন (Destaining of fabrics) : কাপড়ের দাগ উঠাতে **অ্যামাইলেজ** ও **লাইপেজ** এনজাইম ব্যবহার করা হয়। এতে দাগ একেবারে উঠে যায় কিন্তু কাপড়ের কোনো ক্ষতি হয় না।

৪. চামড়া লোমমুক্তকরণ (Dehairing of hide) : ট্যানারিতে লেদার তৈরি করার সময় কাঁচা চামড়া থেকে লোম আলাদা করতে **প্রোটিওলাইটিক এনজাইম** ব্যবহার করা হয়।

৫. ক্ষত নিরাময় (Wound healing) : চামড়ায় সৃষ্ট পোড়া ক্ষত নিরাময়ে এক ধরনের এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৬. হজম সংশোধন (Correcting digestion) : শরীরে এনজাইমের পরিমাণ কমে গেলে হজমে সমস্যা দেখা যায়। এনজাইমের এই ঘাটতি পূরণ হলে হজমে অনিয়ম দূরীভূত হয়। **পেপসিন, অ্যামাইলেজ, পেপেইন** ইত্যাদি এনজাইম হজমে সাহায্য করে।

৭. প্রাণ-রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Analyzing biochemicals) : বর্তমানে ক্লিনিক্যাল বিশ্লেষণে এনজাইম ব্যবহার করা হয়। রক্তে ইউরিয়া ও ইউরিক এসিড শনাক্তকরণে **ইউরিয়েজ** ও **ইউরিকেজ** নামক এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

৮. চোখের ছানির অস্ত্রোপচার (Cataract surgery) : আমেরিকার চক্ষু চিকিৎসক ড. যোসেফ স্পিনা ১৯৮০ সালে এনজাইম **ট্রিপসিন** প্রয়োগ করে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করেন। ড. যোসেফ স্পিনার অস্ত্রোপচার পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম সুঁচ দ্বারা ০.০২৫ সেমি প্রশস্ত ছিদ্র করে অন্য একটি সূক্ষ্ম ফাঁপা সুঁচের সাহায্যে অতি সামান্য পরিমাণ **ট্রিপসিন** চোখের লেন্সে প্রয়োগ করে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়।

৯. চিকিৎসায় এনজাইমের ব্যবহার : ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে শর্করার পরিমাণ কত তা নির্ণয়ের জন্য গ্লুকোজ

CamScanner

অক্সিডেজ ও পারঅক্সিডেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ব্যবহার করে চিকিৎসকগণ অনেকাংশে মৃত্যু ঝুঁকি কমাতে সক্ষম হয়েছেন।

১০. আইসক্রীম ও ক্যান্ডি তৈরিতে : ল্যাকটেজ এনজাইম ব্যবহার করে নরম, মোলায়েম আইসক্রীম এবং ইনভার্টেজ এনজাইম ব্যবহার করে ক্যান্ডি তৈরি করা হয়।

১১. জমাট রক্ত গলানো (Dissolving blood clod) : মস্তিষ্ক ও ধমনীর জমাট রক্ত গলাতে ইউরোকাইনেজ নামক এনজাইমের ব্যবহারে জাপানে সফলতা পেয়েছে।

১২. ফটোগ্রাফি শিল্পে (Photographic industry) : ফটোফিল্মের জেলাটিন পরিষ্কার করতে প্রোটিয়েজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

১৩. কাগজ শিল্পে (Paper industry) : কাগজ বর্ণহীন করার সময় ব্যবহৃত ব্লিচিং (bleach) এর পরিমাণ কমাতে জাইলানেজ, কাগজে মসৃণতা আনতে এবং পানির পরিমাণ কমাতে সেলুলেজ এবং লিগনিন অপসারণ করে কাগজকে মসৃণ করতে লিগনিনেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

১৪. রাবার শিল্পে (Rubber industry) : ল্যাটেক্স থেকে রাবার তৈরি করার সময় হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড থেকে অক্সিজেন তৈরি করতে ক্যাটালেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

১৫. পরিবেশ সংরক্ষণে : পরিবেশে বিভিন্ন বিদূষক পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণে উৎসেচক ব্যবহার করে বায়োসেন্সর তৈরি করা হয়।

১৬. জীবপ্রযুক্তিতে : জিন প্রকৌশলে বিভিন্ন ধরনের উৎসেচক ব্যবহার করে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি, RNA ও DNA এর ক্ষার বিন্যাস নির্ণয় এবং নিউক্লিওটাইডের যোজন বা বিয়োজন করা হয়। রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সহায়তায় DNA অংশের কর্তন, লাইগেজ এনজাইমের সহায়তায় জোড়া লাগানো ও পলিমারেজ এনজাইম সহায়তায় DNA এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

১৭. ডিটারজেন্ট বা পরিষ্কারক প্রস্তুতিতে : ডিটারজেন্ট বা পরিষ্কারক পদার্থ তৈরিতে সেরিন প্রোটিয়েজ, α-অ্যামাইলেজ এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

শর্করা : শর্করাতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সাধারণত বিভিন্ন অনুপাতে থাকে। গঠন অনুসারে শর্করাকে মনোস্যাকারাইড (এক অণু শর্করা দ্বারা গঠিত), অলিগোস্যাকারাইড (আর্দ্র বিশ্লেষণে দুই থেকে দশ অণু সরল শর্করা উৎপন্ন হয়) ও পলিস্যাকারাইডে (আর্দ্র বিশ্লেষণে অসংখ্য সরল শর্করা অণু তৈরি করে) ভাগ করা হয়।

প্রোটিন : অসংখ্য অ্যামিনো এসিড অণু পলিপেপটাইড বন্ধনীতে আবদ্ধ অবস্থায় যে বৃহৎ অণু গঠন করে তাই প্রোটিন হিসেবে পরিচিত। প্রোটিনে সর্বাধিক ২০ ধরনের অ্যামিনো এসিড থাকে এবং এর সাথে অন্য জৈব বা অজৈব অণু যুক্ত থাকতে পারে।

লিপিড : যেসব জৈব পদার্থ পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু অন্যান্য জৈব দ্রবণ যেমন ইথানল, ইথার, ক্লোরোমিথেন প্রভৃতিতে দ্রবণীয় তাদেরকে লিপিড বলে। লিপিড আর্দ্র বিশ্লেষণে ফ্যাটি এসিড ও গিসারল উৎপন্ন করে। রাসায়নিক গঠন অনুসারে লিপিড তিন প্রকার। যথা: সরল, যৌগিক ও উৎপাদিত। আণবিক গঠন অনুসারে লিপিড পাঁচ প্রকার।

এনজাইম: যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করে ও বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত থাকে তাদেরকে এনজাইম বলে। শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত এনজাইমকে সরল এনজাইম ও প্রোটিনের সাথে অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকলে তাকে সংযুক্ত বা কনজুগেটেড এনজাইম বলে। বিক্রিয়ার প্রকৃতি অনুসারে এনজাইমকে ৯ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

প্রোস্থেটিক গ্রুপ : এনজাইমের উপাদানের উপর ভিত্তি করে এনজাইম দুভাগে বিভক্ত-সরল এনজাইম এবং কনজুগেটেড এনজাইম। কনজুগেটেড এনজাইমকে হলো এনজাইম বলে। এর একটি অংশ প্রোটিন এবং অপর অংশটি অপ্রোটিন। অপপ্রাটিন অংশটিকে প্রোস্থেটিক গ্রুপ বলে।

CamScanner

কো-এনজাইম : প্রোস্থেটিক গ্রুপ দুরকমের হতে পারে- একটি ধাতব অংশ (Mn^{++}, Fe^{++} ইত্যাদি) একে **কো-ফ্যাক্টর** বলে। অপরটি জৈব অণু (NAD, FAD ইত্যাদি), একে **কো-এনজাইম** বলে।

রিডিউসিং শ্যুগার : যেসব কার্বোহাইড্রেটের অ্যালডিহাইড মূলক (– CHO) ও কিটোনমূলক (C = O) মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং অন্য যৌগকে বিজারিত করতে পারে, তাদের **রিডিউসিং শ্যুগার বা বিজারক শর্করা** বলে। উদাহরণ-গুকোজ, ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি।

নন-রিডিউসিং শ্যুগার : যেসব কার্বোহাইড্রেটের অ্যালডিহাইডমূলক ও কিটোনমূলক মুক্ত অবস্থায় থাকে না এবং অন্য যৌগকে বিজারিত করতে পারে না, তাদেরকে **নন-রিডিউসিং শ্যুগার বা অবিজারক শর্করা** বলে। উদাহরণ-সুক্রোজ।

গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী : একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে অপর একটি মনোস্যাকারাইডের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সংযুক্তিকে **গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী** বলে। ডাইস্যাকারাইড, অলিগোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইডে একাধিক মনোস্যাকারাইড তাদের গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী দিয়ে পরস্পর যুক্ত থাকে। সুক্রোজ, সেলুলোজ, স্টার্চ প্রভৃতি যৌগসমূহে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনী বিদ্যমান।

পেপটাইড বন্ধনী : পলিপেপটাইড শিকলে বিদ্যমান পাশাপাশি দুটি অ্যামিনো এসিডের একটি কার্বোক্সিল গ্রুপের (-COOH) সাথে অপরটির ৫ অ্যামিনো (NH) গ্রুপের মধ্যে গঠিত বন্ধনীকে **পেপটাইড বন্ধনী** বলে। অসংখ্য অ্যামিনো এসিড পেপটাইড বন্ধনীর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বৃহৎ প্রোটিন অণু গঠন করে।

এ অধ্যায়ে দক্ষতা অর্জন

১. কার্বোহাইড্রেট হলো উচ্চ পলিহাইড্রোক্সি অ্যালকোহলের অ্যালডিহাইড ও কিটোন লব্ধ পদার্থ।
২. কোনো যৌগ থেকে একই কার্যকরী গ্রুপবিশিষ্ট বা সমজাতীয় উদ্ভূত যৌগকে **Derivatives** বলে।
৩. শর্করাতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সাধারণত বিভিন্ন অনুপাতে থাকে।
৪. গঠন অনুসারে শর্করাকে মনোস্যাকারাইড (এক অণু শর্করা দ্বারা গঠিত), অলিগোস্যাকারাইড (আর্দ্র বিশ্লেষণে দুই থেকে দশ অণু সরল শর্করা উৎপন্ন হয়) ও পলিস্যাকারাইডকে (আর্দ্র বিশ্লেষণে অসংখ্য সরল শর্করা অণু তৈরি করে) ভাগ করা হয়।
৫. **ইনভার্ট শ্যুগার** হচ্ছে গুকোজ ও ফ্রুক্টোজ এর মিশ্রণ।
৬. সকল বস্তু রাসায়নিক মৌল দ্বারা গঠিত।
৭. বস্তুজগতের গঠন একক হলো **এটম বা পরমাণু**। এটমের কেন্দ্রস্থলে **প্রোটন** (+) এবং **নিউট্রন** (০) এক সাথে থাকে। কেন্দ্রের বাইরে (নিউক্লিয়াসের বাইরে) নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট **ইলেকট্রন** (–) থাকে।
৮. রাসায়নিক বন্ড সাধারণত তিন প্রকার; যথা Ionic (আয়োনিক), Covalent (কোভ্যালেন্ট) ও Hydrogen bond (হাইড্রোজেন বন্ড)।
৯. আয়োনিক বন্ড প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি এটমের মধ্যে। একটি এটম থেকে এক বা একাধিক ইলেক্ট্রন অন্য এটমে স্থানান্তর হয়।
১০. প্রথম এটম ইলেক্ট্রন হারিয়ে পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট হয় এবং অপরটি ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট হয়।
১১. এটমের চার্জ বিশিষ্ট (+ অথবা –) অবস্থাকে **আয়ন** (ion) বলে।
১২. দুটি এটমের মধ্যে ইলেকট্রন শেয়ার বা ভাগাভাগি হলে **কোভ্যালেন্ট বন্ড** সৃষ্টি হয়।
১৩. দুটি এটমের মধ্যে ইলেক্ট্রন সমানভাগে ভাগাভাগি হলে যে বন্ড তৈরি হয় তা হলো Nonpolar covalent বন্ড।
১৪. ইলেকট্রন দুটি এটমের মধ্যে অসমভাবে ভাগাভাগি হলে যে বন্ড তৈরি হয় তা হলো Polar covalent বন্ড।
১৫. কার্বন পরমাণুর কাঠামো বিশিষ্ট অণু হলো জৈব অণু।
১৬. দুই বা তার অধিক মৌল সুনির্দিষ্ট অনুপাতে সংযুক্ত হয়ে একটি যৌগ বা কম্পাউন্ড গঠন করে।
১৭. জৈব অণুর ক্রিয়াশীল (reactive) গ্রুপকে বলা হয় **ফাংশনাল গ্রুপ**।
১৮. দুটি অ্যামিনো এসিডের মধ্যকার সৃষ্ট বন্ড হল **কোভ্যালেন্ট বন্ড**।
১৯. মনোস্যাকারাইডসমূহের মধ্যকার বন্ড হলো **গ্লাইকোসাইডিক বন্ড**।
২০. যে অণুতে কোনো কার্বন-হাইড্রোজেন পরমাণু নেই তা হলো **অজৈব যৌগ**।

CamScanner

২১. জীবদেহের অধিকাংশ মনোস্যাকারাইড অপটিক্যাল আইসোমারের D সিরিজভুক্ত।
২২. গ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড এবং ডাইহাড্রক্সিঅ্যাসিটেন হল দুটো সরল ট্রায়োজ।
২৩. যে পিচ্ছল জাতীয় পদার্থ দুটি সচল তরলের ঘর্ষণক্ষয় কমাবে বা ঘর্ষণরোধে ব্যবহৃত হয় সেটিই লুব্রিকেন্ট।
২৪. রিডিউসিং শ্যুগার হল যেসব কার্বোহাইড্রেটের অ্যালডিহাইড মূলক (–CHO) ও কিটোনমূলক (>C = O) মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং অন্য যৌগকে বিজারিত করতে পারে।
২৫. নন-রিডিউসিং শ্যুগার হলো যেসব কার্বোহাইড্রেটের অ্যালডিহাইডমূলক ও কিটোনমূলক মুক্ত অবস্থায় থাকে না এবং অন্য যৌগকে বিজারিত করতে পারে না।
২৬. অ্যামাইলোজ এর অণু শৃঙ্খল অশাখ কিন্তু অ্যামাইলোপেকটিনের অণু শৃঙ্খল শাখান্বিত।
২৭. রাইবোজ শর্করা 95°C তাপে গাঢ় HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে **ফারফিউরাল** এসিড উৎপন্ন করে।
২৮. সেলুলোজ অমিষ্ট, ফাইবার সদৃশ ও শক্ত।
২৯. মানুষের পরিপাকতন্ত্রে **সেলুলেজ** এনজাইম থাকে না তা সেলুলোজ হজম করতে পারে না।
৩০. প্রতিটি অ্যামিনো এসিডে কমপক্ষে একটি অ্যামিনো গ্রুপ ($–NH_2$) এবং একটি কার্বোক্সিল গ্রুপ (–COOH) থাকে।
৩১. অ্যামিনো এসিড বর্ণহীন, স্ফটিকাকার তিক্ত পদার্থ।
৩২. এসিড ও ক্ষারবিশিষ্ট অ্যামিনো এসিডের মূলককে **জুইটার আয়ন** (Zuitter Ions; Zuitter = hybrid) বলে।
৩৩. প্রোটিনে হাইড্রক্সিপ্রোপিনের উপস্থিতি খুবই সীমিত। এটি **বিরল অ্যামিনো এসিড**।
৩৪. পলিপেপটাইডগুলো প্রোটিনে সমান্তরালভাবে একটি অক্ষ বরাবর সজ্জিত থাকে তখন তা লম্বা তন্তুর আকার ধারণ করে। এমন আকৃতির প্রোটিনকে **তন্তুময় প্রোটিন** বলে।
৩৫. প্রোটিন গঠনকারী অ্যামিনো এসিড ২০টি।
৩৬. অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড ৮টি (শিশুদের জন্য ১০টি)।
৩৭. সব এনজাইমই প্রোটিন, তবে সব প্রোটিনই এনজাইম নয়।
৩৮. **ইন্টারফেরন** নামক বিশেষ প্রোটিন **ব্লাড ক্যান্সার** নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।
৩৯. মস্তিষ্কে উৎপন্ন **এন্ডোরেফিন** ব্যাথানাশক হিসাবে কাজ করে।
৪০. জীবদেহে উৎপাদিত সকল প্রোটিনের সমষ্টি হলো **প্রোটিওম**।
৪১. ঈস্ট কোষ থেকে জাইমেজ এনজাইম আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৭ সালে।
৪২. লিপিডের সাথে Sudan III দ্রবণ যোগ করলে লাল বর্ণ ধারণ করে।
৪৩. যে সব ট্রাইগ্লিসারাইড অসম্পৃক্ত (unsaturated) ফ্যাটি এসিড দিয়ে তৈরি এবং সাধারণ তাপমাত্রায় (২০° সে.) তরল অবস্থায় থাকে তাকে **তেল** বলে।
৪৪. হৃদপিন্ডের চিকিৎসায় **ডিজিটালিন** ব্যবহৃত হয়।
৪৫. এনজাইমকে জৈব **অনুঘটকও** (organic catalyst) বলা হয়ে থাকে।
৪৬. যে এনজাইম শুধু প্রোটিন দিয়ে গঠিত তাকে বলা হয় **সরল এনজাইম**।
৪৭. কোষ থেকে **ইউরিয়েজ** এনজাইম পৃথক করা হয় ১৯২৬ সালে; এটি পৃথক করেন **জ্যামস সামনার**।
৪৮. কোনো কোনো এনজাইমে প্রোটিন অংশের সাথে একটি অপ্রোটিন অংশ সংযুক্ত থাকে। সংযুক্ত সেই অপ্রোটিন অংশকে **প্রোস্থেটিক গ্রুপ** বলে। প্রোসথেটিক গ্রুপটি কোনো মেটাল হলে সেই মেটাল অংশকে বলা হয় **কোফ্যাক্টর**।
৪৯. **ট্রান্সফারেজ** এনজাইম হলো কোনো একটি পদার্থ হতে একটি গ্রুপকে (যেমন– (NH_2) অপসারিত করে অন্য একটি পদার্থের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা করে; যেমন– কাইনেজ।
৫০. ঔষধ শিল্পে ও ফলের জুস ও বিভিন্ন ধরনের পানীয় তৈরীতে **সেলুলেজ** এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
৫১. চোখের ছানি অপারেশনে **ট্রিপসিন** এনজাইম ব্যবহার করা হয়।
৫২. **রেস্ট্রিকশন** এনজাইম দিয়ে DNA অণুর অংশ কাটা হয় এবং **লাইগেজ** এনজাইম দিয়ে কাটা DNA খণ্ড জোড়া লাগানো হয়।
৫৩. পলিমারেজ এনজাইমের সহায়তায় DNA এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

CamScanner